ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তি এবং ১৭৫৭ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস

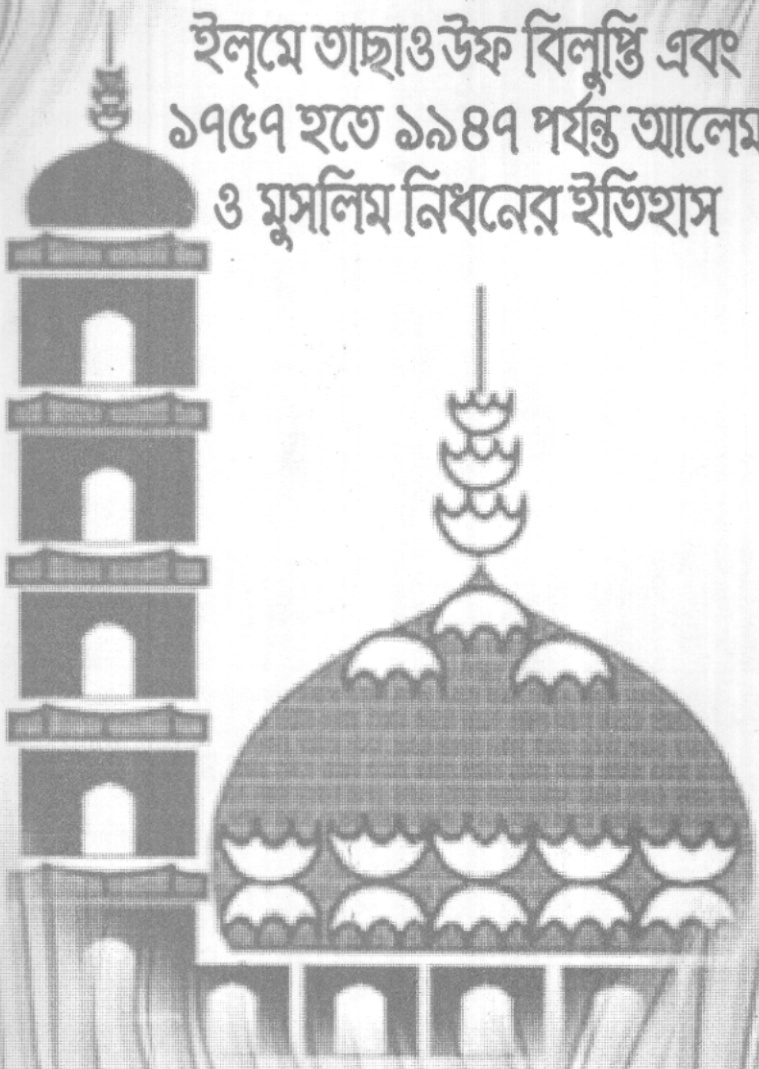

ইবনে আইয়ুব

ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তি এবং ১৭৫৭ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত
আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস।

ইব্‌নে আইয়ুব

প্রকাশকঃ

ইব্‌নে উমর

ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তি এবং ১৭৫৭ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত
আলেম ও মুসলিম নিধনের সঠিক ইতিহাস বিশ্ববাসীকে জানানোর
জন্য ধর্মীয় সাহায্যস্বরূপ বিনিময় মূল্যঃ-২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

বইটিতে কি কি পাবেন

- ❑ ভূমিকা
- ❑ ভারত বর্ষ হতে ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তি এবং আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস।
- ❑ ভারত বর্ষের মাদ্রাসা সমূহ হতে ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইতিহাস।
- ❑ ভারত বর্ষের আলেমদের থেকে ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইতিহাস।
- ❑ আলিয়া রুলের মাদ্রাসা হতে ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইতিহাস।
- ❑ দেওবন্দ রুলের মাদ্রাসা হতে ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইতিহাস।
- ❑ আলেম ও মুসলিম নিধন করার জন্য হিন্দু ঠাকুরদের বিশেষ ফত্‌ওয়া।
- ❑ কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানে আলেম ও মুসলমান নিধনের ইতিহাস।
- ❑ হুগলিতে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস।
- ❑ থানা ভবনে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস।
- ❑ আলেম ও মুসলিম নিধন করার ইংরেজদের একটি কৌশল।
- ❑ আলেম ও মুসলমানদের প্রতি অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস।
- ❑ আলেম ও মুসলমানদেরকে হত্যার পদ্ধতি।
- ❑ ঢাকায় আলেম এবং মুসলিম নিধন ও শোষণের ইতিহাস।
- ❑ বিহার গড়মুক্তেশ্বরে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস।
- ❑ কোলকাতা এবং বিভিন্ন স্থানে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস।
- ❑ লাখনৌ কলকাতা এবং লাহরে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস।
- ❑ দিল্লীতে আলেম এবং মুসলিম নিধন ও শোষণের ইতিহাস।
- ❑ হাজার হাজার কারাদন্ড ও নির্বাসন আলেমদের মধ্য থেকে উদাহরণ হিসাবে শুধু মাত্র মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদীর কারা ও নির্বাসন জীবনের অবস্থা।

ভূমিকা

পবিত্র কুর্‌আন, হাদীস, মাজহাবের কিতাব ও অতীত যুগের নায়েবে রাসুল গণের কিতাব সমূহে দেখা যায়, আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ এই তিন প্রকার মাছ্‌য়ালার সমষ্টি নাম শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম। যথাঃ তাফসীরে বায়জাবী শরীফের ১২৫ পাতায় লেখা আছে মূল কথা- কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে ও অস্পষ্টভাবে যত মাছয়ালা বর্ণনা হয়েছে, তার সংখ্যা অনেক বেশী এবং তার শাখা-প্রশাখার মাছ্‌য়ালা আরও অনেক বেশী। কুরআন শরীফের মাছয়ালা সমূহ যতই বেশী হোকনা কেন তা তিন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ যথা- আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ। এই তিন প্রকার মাছ্‌য়ালা শিক্ষা করা ফরজে আইন। অনুরূপভাবে তাফসীরে রূহুল মা'য়ানীতেও উল্লেখ আছে।

হাদীসে জিব্‌রাইলের ব্যাখ্যায় মাজহারে হক কিতাবের ১ম খন্ডের ২৪ পাতায় লিখা আছে– মূল অর্থঃ– জানা চাই যে, দ্বীন ইসলাম এর মূল ও পূর্ণতা আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ এ তিন বিষয়ের উপরে। এ তিন ভাগেই ইসলাম পূর্ণ হয়। অত্র হাদীসে এ তিন ও বিষয় আলোচনা হয়েছে।

হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফতুয়ার কিতাব শামী তার ১ম খন্ডের ৪০ পাতায় লেখা আছে–মূলকথা- ঈমানদারদের উপর আবশ্যক পরিমাণ ফিকাহ ও ইল্‌মে তাছাওউফ বা ইল্‌মে ক্বলব শিক্ষা করা ফরজে আইন। হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) এর জখিরায়ে কেরামতের জাদুত্‌তাকওয়া খণ্ডে লেখা আছে -মূলকথাঃ- তোমরা ভালরূপে জেনে রাখ, যে ধর্মের ভিত্তি ও পূর্ণতা আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু বর্তমানে আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের সমষ্টি শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম পুরাভাবে নেই। ইসলাম ধর্ম বা শরীয়তের নাম মাত্র আছে। যথা- রাসুল (সঃ) বলেছেন-"মানুষের উপর এমন একটা যামানা আসবে, মুসলমানদের ভিতরে ইসলাম ধর্ম থাকবে না। শুধু ইসলাম ধর্মের নাম থাকবে এবং কুরআন থাকবে না, শুধু কুরআন পাঠের রছম থাকবে। (এ অবস্থা কখন হবে) যখন মসজিদ গুলো

দালান কোঠা তথা জাঁক জমকপূর্ণ হবে। তখন মসজিদ গুলো হেদায়েত হিসাবে বিরাণ থাকবে"। অর্থাৎ ইমাম ও মোক্তাদী কারও মধ্যে পুরা ইসলাম থাকবে না। রাসুল (সঃ) যখন এ হাদীস বলেছেন, তখন মদীনার মসজিদে ছিল খেঁজুর পাতার ছাউনি। (প্রকাশ থাকে যে, মসজিদ দালান-কোঠা তথা জাঁকজমক পূর্ণ হওয়াটা মুসলমানদের জন্য আনন্দের সংবাদ কিন্তু দ্বীন যে থাকবে না এটা অত্যন্ত দুঃখের সংবাদ)। বর্ণিত হাদীসে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে মসজিদগুলো যখন দালান-কোঠা তথা জাঁকজমক পূর্ণ হবে তখন মুসলমানদের ভিতরে পুরা ইসলাম থাকবে না। সুতরাং এখন মসজিদগুলো যখন দালান কোঠা তথা জাঁকজমক পূর্ণ, তখন মুসলমানদের ভিতর থেকে পুরা ইসলাম উঠে গেছে। কিভাবে উঠে গেছে এ মর্মে রাসুল (সঃ) বলেছেন-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের থেকে ইলেম ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন না, যেরূপ একজন অপর একজনের কাছ থেকে একটি জিনিস নিয়ে যায়। বরং আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলেম উঠিয়ে নিবেন"। এ হাদীসে পরিস্কার বুঝা যায় যে পুরা ইসলাম জানা আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে পুরা ইসলাম মুসলমানদের ভিতর থেকে উঠে যাবে। আর আজ দেখা যায় যে, আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের সমষ্টি শরীয়ত বা ইসলাম ধর্মের মধ্য থেকে বিশেষ করে ইল্‌মে তাছাওউফের শিক্ষা ও আমল বর্তমান মুসলমানদের ভিতরে নেই। সুতরাং মুসলমানদের থেকে ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্ত হয়েছে। আর হাদীসে পাওয়া গেল আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে পুরা ইসলাম মুসলমানদের ভিতর থেকে বিলুপ্ত হবে। সুতরাং কিভাবে আলেমদেরকে নিধনের মাধ্যমে আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের সমষ্টি শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম হতে মুসলমানদের ভিতর থেকে ইলমে তাছাওউফ বিলুপ্ত হল তা অত্র কিতাবে লেখা হল। আর কিতাব খানার নাম ইলমে তাছাওউফ বিলুপ্তি এবং ১৭৫৭ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস রাখা হল। বিভিন্ন বই হতে ইতিহাস সংগ্রহ করে লেখা হল এবং বইগুলির নামও উল্লেখ করা হল। কারও কাছে এ বিষয়ে আরো কোন উল্লেখযোগ্য সঠিক ইতিহাস থাকলে প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

গ্রন্থকার

ভারত বর্ষ হতে ইলমে তাছাওউফ বিলুপ্তি এবং আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস

ইংরেজরা যখন পুরাদমে ব্যবসা শুরু করে। তখন বাংলার নবাব ছিলেন আলী বর্দিখান। তিনি বুঝেছিলেন যে, ইংরেজরা বাণিজ্য করার নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। তাই তিনি তাদেরকে দুর্গ তৈরী করার অনুমতি দেননি। (প্রকাশ থাকে যে, ইংরেজরা নিজেরাই রাতের আঁধারে তাদের ব্যবসার মালামাল লুট করে, দিনের বেলা অভিযোগ করত যে তাদের ব্যবসার মালামাল প্রায়ই এভাবে লুট হচ্ছে। সুতরাং তাদের ব্যবসার মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুর্গ তৈরী করে কিছু সৈন্য আনা প্রয়োজন।)

তার মৃত্যুর পর ১৭৫৬ সালে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন তার দৌহিত্র (মেয়ের ঘরের নাতি) সিরাজ উদ্দৌলা। নতুন নবাবকে উপেক্ষা করে ইংরেজরা দুর্গ তৈরী করতে শুরু করে। শুধু তাই নয় নবাবকে সরিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য কোম্পানীর প্রভাবশালী কর্মচারীরা ক্লাইভের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র শুরু করে।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানের কতক এনজিওর মতই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতেও শত শত মানুষ মোটা অংকের বেতনে চাকুরী করত। শত সহস্র মানুষ ঐ কোম্পানী থেকে মোটা অংকের ঋণও নিয়েছিল। তাই তারা চিন্তা করল কোম্পানী না থাকলে তাদের চাকুরী থাকবে না, ঋণ ও ফেরত দিয়ে দিতে হবে। তাহলে তাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনের কি অবস্থা হবে ? সুতরাং এটা ভেবে তারা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল।

ইংরেজরা মীর জাফরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরেই একমাত্র তাকেই সিংহাসনে বসানো হবে। এ জন্য নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর, জগৎ শেঠ এবং রাজবল্লভ ও এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে মীর জাফর অস্ত্র জমা নেয় এবং যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণা করে। সুতরাং ষড়যন্ত্র অনুযায়ী রাতের আধারে ইংরেজ সৈন্যগণ যখন আক্রমন করে তখন কাঠের পুতুলের মত মীর জাফর ও তার সাথীয় অন্যান্য

বিশ্বাসঘাতক সেনাগণ অস্ত্রবিহীন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। একমাত্র তাদের এই বিশ্বাস ঘাতকতার কারণেই ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্‌দ্দৌলা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। পরে তাকে ও তার বংশাবলীর সকলকে নির্বিচারে এরূপভাবে কচুকাটা করে হত্যা করা হয় যাতে বংশের রক্ত ও চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও থাকতে না পারে।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজরা তখনই সমস্ত ক্ষমতা দখল করেনি। তারা মীর জাফরকে সিংহাসনে বসায়। অবশ্য আসল ক্ষমতা ছিল ইংরেজদেরই হাতে। ইংরেজরা মীর জাফরকে বুঝাল নবাব চৌকিদার থেকে শুরু করে বড় বড় পদ পর্যন্ত যাদেরকে চাকুরী দিয়েছে তারা তারই গুনগান গাইবে, তার কথাই বলবে সুতরাং তোমার ক্ষমতায় থাকতে কষ্ট হবে। তাই তাদেরকে কচু কাটা করে হত্যা করে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দাও। তাই ইংরেজদের পরামর্শ মত ইংরেজদের দ্বারা সকল পোষ্টের আলেমকে পাইকারীভাবে হত্যা করে নিধন করা হল।

প্রকাশ থাকে যে, ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত রাজ ভাষা ছিল ফার্সি। মুসলিম ধর্মের আইন অনুযায়ী বিচার চলত। আর নবাবী আমল পর্যন্ত শুধুমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষাই চালু ছিল। সুতরাং প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমরাই চাকুরি করত। তাই মীর জাফর আবার চৌকিদার থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ সকল পদে আলেমদেরকেই চাকুরিতে নিযুক্ত করল।

এবারে কিছু দিন পর তারা মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমকে হাত করে মীর কাসিমের দ্বারা মীর জাফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায়। ইংরেজদের সাহায্যের দ্বারা এ যুদ্ধে মীর কাসেম বিজয়ও হয় আর মীর জাফর পরাজিত ও বন্দী হয়। এবারেও ইংরেজরা পুরা ক্ষমতা দখল না করে মীর কাসিমকে সিংহাসনে বসায় কিন্তু আসল ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের হাতে। এবারে তারা মীর কাসিমকে বুঝালো তোমার শ্বশুরের নিযুক্ত কর্মচারীরা জীবিত থাকলে তারা আবার তোমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। সুতরাং তুমি মীর জাফরের মতই সকল পদের আলেমদের নিধন কর। ইংরেজদের পরামর্শে ২য় কাটায়ও ইংরেজদের দ্বারা আবার সকল পদে চাকুরীতে নিযুক্ত আলেমদের হত্যা করা হয়। মীর কাসিম আবার সকল পদের চাকুরিতে আলেমদেরকে

নিযুক্ত করল। কিন্তু মীর কাসিম ইংরেজদের কিছু কর্মকান্ডে বাধা দিতে চাইলে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মীর কাসিম পরাজিত হন। এরপর থেকেই ইংরেজরা পুরাপুরি ক্ষমতা দখল করতে শুরু করে। ইংরেজরা মীর কাসিমকে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহন করে মীর কাসিমের নিযুক্ত সকল পদের আলেমদেরকে হত্যা করে। এমনকি ব্রেনী মুসলমানদেরকেও কচুকাটা করে পাইকারী ভাবে হত্যা করে।

মুসলিম নিধনে ইংরেজরা হিন্দুদেরকেও শরীক লওয়ার জন্য তারা হিন্দুদের পুরাপুরি বুঝাতে সক্ষম হয় যে, তোমরা মুসলিম নিধনে শরীক হও, যত রকম চাকুরি ও মাতুব্বরী তোমরাই পাবে। মুসলমানদের অধীন হয়ে, তাদের গোলাম আর তোমাদের থাকতে হবে না। বরং মুসলমানরাই হবে তোমাদের গোলাম। অপরদিকে প্রায় নবী ও রাসুলরাই মূর্তি পূজাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাই পূর্ব থেকেই মুসলমানরা হিন্দুদের শত্রু ছিল সুতরাং ইংরেজদের মত হিন্দুদের ও মুসলিম নিধন করা চিরাচরিত অভ্যাস ছিল। এই জন্যই গৌর গোবিন্দ, পৃথ্বিরাজ ও কলসকাঠীর রাজেশ্বর বাবু পাইকারী ভাবে মুসলিম নিধন করেছে। ইংরেজ ও হিন্দুরা সম্মিলিত ভাবে আলেম ও মুসলমানদেরকে কচুকাটা করে কয়েকবার পাইকারীভাবে হত্যা করার ফলে এবং মুসলমানদের প্রতি নিপীড়ন ও শোষণের কারণে অনাহারে বাংলার তিনভাগের একভাগ মানুষ অধিকাংশ মুসলমান মারা যায়। ইতিহাসে ইহা ছিয়াত্তরের মন্বনন্তর নামে পরিচিত।

এরপর থেকে ইংরেজ ও হিন্দুরা মিলে রাষ্ট্রের পোষ্টগুলো ভাগ করে নিয়ে নিপীড়ন ও শোষণের ধারা অব্যাহত রেখে, ১৮০৩ সালে মুসলিম সম্রাট শাহআলম থেকে রাজ্য নেওয়ার পর সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদেরই অধীনে আসে। এভাবেই আলেম ও মুসলিম নিধনের মধ্য দিয়েই ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্ত হল।

ভারত বর্ষের মাদ্‌রাসা সমূহ হতে ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইতিহাস

ইংরেজরা ভাল ভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, মুসলমানরা সহজে নতী স্বীকার করার মত নয়। তাই এই দেশে তাদের ক্ষমতার মসনদ সুদৃঢ় করতে হলে, মুসলিম জাতির জাতিসত্ত্বাবোধ ও আদর্শিক চেতনাকে হত্যা করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তারা ভাল ভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতিই তাদের চেতনার উৎস বিন্দু। সুতরাং তার ধ্বংস সাধনকেই তারা তাদের প্রধান টার্গেট হিসাবে নির্ধারণ করে ছিল।

মুসলিম সরকার সমূহের পৃষ্ঠ পোষকতায় হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল গ্রামে গঞ্জে শহরে-বন্দরে। শুধু দিল্লীতেই তখন ১ হাজার মাদ্‌রাসা ছিল। প্রফেসর মার্ক মিল্‌স বলেন–"বৃটিশ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই ৮০ হাজার মাদ্‌রাসা ছিল।" ইংরেজরা ভাল করেই বুঝে ছিল যে, ঘোষণার মাধ্যমে এ সমস্ত মাদ্‌রাসা গুলোকে ধ্বংস করতে গেলে গণ বিদ্রোহ ঠেকানো কঠিন হবে।

তাই ইংরেজরা ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত জায়গীরগুলো বাতিল করে, ভূমিনীতিতে পাঁচ সালা ও দশ সালা বন্দোবস্ত নীতি প্রবর্তন করে এবং প্রতিষ্ঠানের উৎস ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করে, প্রতিষ্ঠান সমূহের আয়ের পথ রুদ্ধ করে দেয়। এমন কি মুসলিম শাসকদের আমলে মাদ্‌রাসা গুলোকে যে রাষ্ট্রীয় অর্থানুকুল্য প্রদান করা হত তাও বন্ধ করে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে অর্থের অভাবে এই সমস্ত মাদ্‌রাসা গুলো আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপরও জনগনের অনুদানের উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত মাদ্‌রাসা গুলো চলতে ছিল সে গুলোকেও নানা ভাবে হয়রানী করে, এর ফলে এগুলোও এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রতিটি মসজিদের সঙ্গে মক্‌তব মাদ্‌রাসা ছিল, তজ্জন্য মসজিদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া ছিল। কোম্পানী কর্তৃক এই সকল জমি খাস করার ফলে মকতব মাদ্‌রাসাও উঠে গেল। এর ফলে অনেক মসজিদ তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির ও গীর্জায়

রূপান্তরিত হয় এবং অনেক স্থানের মসজিদে লোকেরা গান বাদ্য করিত। হিন্দুগণ বর যাত্রী রাখিত, আড্ডা দিত ও শরাব পান করিত (জাদুত্‌তাকওয়া)।

মুসলমানদের লেবাস পোষাককে ব্যঙ্গ করার জন্য খানসামা ও দারোয়ানের পোশাক নির্ধারণ করা হয়েছিল পায়জামা, পাঞ্জামী ও পাগড়ী।

এভাবে ইংরেজরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম আমলের প্রতিষ্ঠিত কুরআন, সুন্নাহ ভিত্তিক মাদ্‌রাসা সমূহকে নির্বিচারে ধ্বংস করে দেয় এবং সে স্থলে ইংরেজদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা পুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করে। যাতে কেউ নামে মুসলিম হয়েও চিন্তা চেতনায় ইংরেজ হতে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে ইংলন্ডের লর্ড ম্যাকলে পরিস্কার ভাষায় বলেছিলেন, "ভারতীয়দের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হল এমন এক যুব সম্প্রদায় সৃষ্টি করা যারা রং ও বংশের দিক থেকে ভারতীয় হলেও মন ও মস্তিস্কের দিক থেকে হবে সম্পূর্ণ বিলাতী (খ্রিষ্টান)"। ইংরেজদের বক্তব্য ছিল, আমাদের গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা দেশে প্রচলিত সকল ধর্ম ও রীতি-নীতি বিলুপ্ত করে সকলকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। এর ফলে এদেশের ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে। যেখানে এদেশের প্রতি ঘরে ঘরেই কেউনা কেউ একজন আলেম ছিল। সেখানে গ্রামকে গ্রাম খুঁজেও জানাযার নামাজ পড়াবার জন্যও একজন আলেম পাওয়া যেতনা। এভাবেই মুসলিম শাসকদের আমলে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা সমূহ বিলীন হওয়ার মধ্য দিয়েই ভারত বর্ষের মাদ্রাসা সমূহ হতে ইল্‌মে তাছাওউফ বিলুপ্ত হয়।

ভারত বর্ষের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ পাইকারীভাবে ধ্বংস ও আলেম এবং মুসলমানদের নিধন করার ফলে শুধু যে ইল্‌মে তাছাওউফই বিলুপ্ত হয়েছিল তাই নয় অনেক স্থান হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া তো দূরের কথা পাঁচবার আজান দেওয়ার বিধানও বিলুপ্ত হয়েছিল। বহু স্থানে মসজিদ ছিল সত্য কিন্তু তাহাতে ইমাম, মোয়াজ্জিন বা নামাজী ছিলনা– আর জামায়াত মোটেও হইতনা। ভোরে ও সন্ধ্যায় আজান দিয়া লোকদিগকে সন্ধ্যা ও প্রভাতের সংবাদ দেওয়া ব্যতিত শহর বাসীদের মসজিদ গুলোর সঙ্গে অন্য কোন সম্পর্ক ছিলনা। ঐ সময় মানুষ আজান, ইকামত, নামাজ ও জামাতের

সাথে এত সম্পর্কহীন ও অপরিচিত ছিল যে, দিনের বেলা আজানের শব্দ শুনলে আশ্চর্য্য বোধ করিত এবং বলিত আরে মিয়া দিনের বেলায় আবার আজান কিসের। জনাব মাওলানা সাহেব নিজের বর্ণনায় উক্ত বিষয় লিখিয়াছেন–"এই ফকির পাঁচবার যখন আজানের ব্যবস্থা করিলাম তখন কোন কোন অজ্ঞ মুসলিম বলিতে লাগিল, ভোরে ও সন্ধ্যায় আজান শুনিয়াছি। কিন্তু দিনে কখনও আজান শুনি নাই। ইহা একটি নতুন নিয়ম বাহির হইয়াছে।" *(জাদুত্‌তাকওয়া)*

হযরত মাওলানা কেরামত আলী সাহেব নিজেই বলিয়াছেন যে– "আমি একদা জৈন পুরের প্রসিদ্ধ নেতা মুন্সি ইমাম বকসের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম তখন একজন বৃদ্ধা মেয়ে লোক দূর হইতে আমাকে দেখিল তাহার হাতে একটি পাতিল ছিল সে উহাকে ধৌত করিবার জন্য নিয়া যাইতে ছিল। যখন বৃদ্ধা আমার নিকটবর্তী হইল তখন সে পাতিলটি সজোরে আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল এই নতুন মৌলভীই দিনের বেলায় আজানের প্রচলন করিয়াছে"।

[হযরত মাওলানা জৈনপুরী কেরামত আলী সাহেবের জীবনী– লেখক মাওলানা আবদুল বাতের জৈনপুরী]।

মুসলমানগণ শিক্ষা-দিক্ষায় এমনই অধঃপতনে নেমে এসেছিল যে, বহু মুসলমান হিন্দুদের মত ধূতি পরতো, গলায় পইতা দিত, হিন্দুদের সাথে পূঁজায় যোগ দিত, লক্ষ্মীপূঁজা এমন কি আসামের মুসলমানগণ লজ্জাস্থান ঢাকারও আবশ্যক মনে করত না। হযরত মাওলানা কেরামত আলী সাহেব আসামে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সেখানকার লোকেরা বর্বরদের মত বসবাস করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে মুসলমানের কোন চিহ্ন নেই। এমনকি তারা পোশাক পরিচ্ছেদ তো দূরের কথা লজ্জাস্থান ঢাকিবারও আবশ্যক মনে করত না। অধিকাংশ লোক উলঙ্গ এবং কেহ কেহ লেংটি পরিয়া কাল কাটাইত। মাওলানা সাহেব তাহাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য একটি কাপড় ও একটি টুপি প্রদান করেন। অতঃপর চার হাজার লুঙ্গি ও কিছু থান কাপড় লোকদের মধ্যে বন্টন করেন।

[কিতাবে এছতেকামাত লেখকঃ হযরত মাওলানা কেরামত আলী]

ভারতবর্ষের আলেমদের থেকে ইলমে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইতিহাস

বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন- "আমার উম্মতের একদল কেয়ামত উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সত্যের উপর প্রবল থাকবে"। এ জন্যই ইংরেজদের পাইকারীভাবে আলেম নিধনের মধ্য দিয়েও আল্লাহর অসীম মেহেরবাণীতে বৃদ্ধ এবং কোন পদে চাকুরিতে নিযুক্ত না থাকার কারণেই বেঁচে রইলেন তৎকালীন নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ (রহঃ)।

"ইংরেজদের পূর্ব যুগে দেশের সকল শ্রেণীর লোক সুফিদের (তাছাওউফবিদদের) আধ্যাত্মিক (তাছাওউফের) জ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল ছিল। এমনকি জনসাধারণ সুফিদের (তাছাওউফবিদদের) অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ করতে রাজি হতো না। সুতরাং যিনি সুফি (তাছাওউফ) মতবাদ মেনে নিতে অস্বীকার করতেন অথবা উপেক্ষা করে চলতে চাইতেন, তার কথার প্রতি আদৌ কোন গুরুত্ব দেয়া হতো না এবং তিনি ধার্মিক ব্যক্তি রূপেও পরিগণিত হতেন না। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ উল্লেখ করেন যে, এসব কারণে আধ্যাত্মিক (তাছাওউফ) জ্ঞানের চর্চা তৎকালীন ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে বিবেচিত হতো"। *[শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ও তার রাজনৈতিক চিন্তা-ধারা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী]*।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি দীর্ঘ এগারো বছর কাল সাধনার পরে কুরআন শরীফের ফারসী তরজমা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাফসীরের কথা যখন প্রকাশিত হলো ইংরেজদের প্ররোচণায় তখন দেশে বিপুল বিরুদ্ধতা দেখা দিল। গোঁড়া আলেমগণ মনে করছিলেন যে, তাঁদের রুযী-রুটির ইমারাত বুঝি বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। জনসাধারণকে অতঃপর আয়ত্তে রাখা সম্ভব হবে না, তারা কথায় কথায় প্রতিবাদ করবে। সুতরাং তারা শাহ্ সাহেবের প্রতি কুফরী ফতোয়া দেয়া ছাড়াও তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিল তাদের প্ররোচণায় কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারী তাঁর প্রতি হামলার সুযোগ খোঁজতে থাকে। এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শাহ্ সাহেবের মনে

কখনো কোন সন্দেহ পর্যন্ত উদয় হয়নি। একদিন তিনি ফতেপুর মসজিদে আসরের নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ শেষ করে সালাম ফিরাবার সাথে সাথেই মসজিদের দরজায় সোরগোল শুনতে পেলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারী শাহ্ সাহেবকে আক্রমণ করার উদ্যোগ করছে। শাহ্ সাহেবের সাথে ছিল অল্প কয়েকজন অনুচর। আক্রমণকারীরা ছিল সংখ্যায় অনেক। শাহ্ সাহেব খারীবাউলী দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে দরজাও তারা ঘিরে ফেলেছিল। শাহ্ সাহেবের হাতে ছিল একখানা মাত্র ছড়ি। অগত্যা তিনি আক্রমণোদ্যত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা তাকে কেন হত্যা করতে চায়? তারা বললো-আপনি কুরআন শরীফের তরজমা করে জনসাধারণের কাছে আমাদের মর্যাদাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। এটা চললে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কোন মূল্যই থাকবে না। আপনি শুধু আমাদের মর্যাদার হানি করেননি, বরং আমাদের পরবর্তী বংশধরদেরও সর্বনাশ করেছেন। শাহ্ সাহেব উত্তরে বললেন-আল্লাহ সার্বজনীন রহমতের দান কতিপয় লোকের জন্য এবং তাদের বংশাবলীর জন্য কি করে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে ? কিছু সময় এভাবে বাদ-প্রতিবাদ চললো। ইত্যবসরে শাহ্ সাহেবের সঙ্গীগণ তলোয়ার শানিত করে নিলেন। তলোয়ার দেখে আলেমগণ কর্তৃক আমদানীকৃত দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে গেল। শাহ্ সাহেব নিরাপদে গৃহে ফিরে এলেন।

[হায়াতে ওয়ালী-৩২১ পৃষ্ঠা]।

প্রকাশ থাকে যে, "হায়াতে ওয়ালী"র লেখক এই বর্ণনা মির্‌যা হায়রাত দেহলবী থেকে গ্রহণ করেছেন। আসল ব্যাপার সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তা এই যে, জনসাধারণ কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হোক, ইংরেজদের প্ররোচণায় শিয়া মতাবলম্বী শাসনকর্তারা তা চাইতেন না। "আমীরুর রওয়ায়াত" গ্রন্থে আছে যে, দিল্লীতে তখন নজফ আলী খাঁর কর্তৃত্ব ছিলো। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে সে শাহ্ সাহেবের হাতের কব্জি অকর্মণ্য করে দিয়েছিল, যাতে তিনি কোন পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখতে না পারেন।

[শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ও তার রাজনৈতিক চিন্তা ধারা
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী]

এতো বাঁধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও নায়েবে রাসুল শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর পুত্র শাহ্ আবদুল আজীজকে অত্যন্ত হেকমত ও কৌশলে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি মৃত্যুর সময় তার পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজকে খেলাফতি দিয়া যান। দীর্ঘদিন যাবত হেদায়েতের পর নায়েবে রাসুল শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ৬১ বছর বয়সে ১৭৬৫ সালে ইন্তেকাল করেন।

নায়েবে রাসুল শাহ্ ওয়ালী উল্লাহের ইন্তেকালের পর তার সন্তান ও খলিফা নায়েবে রাসুল শাহ্ আবদুল আজিজ গোপনে গোপনে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, গোয়েন্দা কর্তৃক এ সংবাদ ইংরেজদের কাছে পৌছলে, ইংরেজরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে এবং নায়েবে রাসুল শাহ্ আবদুল আজিজের গাঁয়ে এক ধরনের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আর তার অন্য চার ভাইকে দেশান্তর করা হয়। এতেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হয়নি তাঁকে নজরবন্দিও করে রাখে।

এত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও নায়েবে রাসুল শাহ্ আবদুল আজিজের কাছ থেকে, ইংরেজরা যাতে বুঝতে না পারে সেই জন্য কাজের লোকের বাহানা করে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস একদা ইংরেজদের গোয়েন্দারা ছদ্মবেশে এসে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে কয়েকটি প্রশ্ন করে। কিন্তু সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ব্যাপারটা আঁচ করতে না পেরে গোয়েন্দাদের প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিয়ে দিলেন। এর ফলে গোয়েন্দারা বুঝতে পারল শাহ্ আবদুল আজিজের কাছ থেকে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা সমাপ্ত করছে। সুতরাং এ সংবাদ গোয়েন্দারা ইংরেজদের কাছে পৌছালো। তাই ইংরেজরা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে গুলি করার অর্ডার দিয়েছিল।এ খবর নায়েবে রাসুল শাহ্ আবদুল আজিজ শুনতে পেয়ে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে খেলাফতি দিয়ে তার নিজ দেশ পাঞ্জাবে পাঠায়ে দিলেন। পাঞ্জাব তখন পর্যন্ত ইংরেজদের দখলে যায়নি। সেখানে ছিল শিখদের রাজত্ব। এই শিখেরা ছিল খুবই উগ্রপন্থী।

এরপর থেকে যারা নায়েবে রাসুল শাহ্ আব্দুল আজিজের কাছে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার জন্য আসত। তিনি তাদেরকে পাঞ্জাবে নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর কাছে পাঠায়ে দিতেন। এভাবে পাঠাতে পাঠাতে শুধু মাওলানাদের সংখ্যাই হয় ১২০০ জন। যারা নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর কাছে ইলমে তাছাওউফ শিখতে থাকে।

নায়েবে রাসুল শাহ্ আবদুল আজিজের ইন্তেকালের পর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ব্যাপকভাবে হেদায়েতের কাজ চালাতে থাকেন। সুতরাং ইংরেজদের এবার দৃষ্টি পরল তৎকালীন নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর প্রতি। তাই তারা পাঞ্জাবের শাসনকর্তা রণজিৎ সিংকে বুঝাল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও তাঁর অনুসারীরা তোমার পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে নিচ্ছে অথচ এই মুহূর্তে তুমি নীরব। তাড়াতাড়ি মুসলমানদের নিধন কর। আমরাও তোমাদের সাথে আছি। তা না হলে তোমার পায়ের নিচের মাটি থাকবে না। তাই মুসলমানদের নিধনের জন্য তাদের ঠাকুরেরা এই মর্মে ফত্ওয়া দিল যে, এক একটি গাভীর মধ্যে ৮৪টি দেবতা। সুতরাং যারা উহা যবেহ করিয়া ভক্ষণ করে তারা হল রাক্ষুস, তাদের হত্যা করা পুণ্যের কাজ। ঠাকুরদের এই ফত্ওয়া অনুযায়ী কেহ গরু যবেহ করলে পুণ্যের কাজ মনে করে তাকে হত্যা করা হত। এই জন্যই ইউরোপীয় জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন- "গো জবাইয়ের মত নগন্য অপরাধেও কোন কোন মুসলিম পরিবারকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে"।

মুসলমানরা হিন্দুদের এই খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য গরু যবেহ করা থেকে বিরত রইল। কুরবাণীর সময়ে নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী মুসলমানদেরকে গরু ব্যতীত অন্যান্য পশু দ্বারা কুরবাণী দিতে আদেশ দিলেন। যখন তারা এই ফন্দীর দ্বারা মুসলমানদের নিধন করতে পারল না। তখন তারা ঘোষণা করল যে, আজানে বলা হয় আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। একমাত্র ইসলাম ধর্ম সত্য অন্য সকল ধর্ম মিথ্যা। ইহা আমাদের ধর্মের বিরোধী তাই আজান দিয়া আমাদের ধর্মের বিরোধীতা করা হয়। সুতরাং যারা আজান দিবে তাদেরকেও হত্যা করা হবে। এই জন্যই জনৈক ইউরোপীয় লিখেছেন–

"শিখেরা পাঞ্জাবে আজান দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। জামাতে নামাজ পড়াতো দূরের কথা"।

ইহাতে নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও তাঁর অনুসারীরা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলেন যে, এ সমস্ত কিছুর মূলে হচ্ছে মুসলমানদেরকে নিধন করা। তাই তাঁরাও সিদ্ধান্ত নিলেন যখন আমাদের মরতেই হবে তখন আমরা লড়িয়াই মরিব।

তাই বাধ্য হয়ে মুসলমানগণ শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাঁরা নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করে অল্পদিনের মধ্যেই পাট্‌না, লাখনৌ, এলাহাবাদ ও কাশ্মীর ইত্যাদি কয়েকটি পরগনা দখল করে ফেলেন। এভাবেই বিভিন্ন স্থান দখলের কারণে যখন রণজিৎ সিং-এর পায়ের নিচের মাটি ক্রমান্বয়ে সরে যেতে লাগল, তখন তিনি ইংরেজদের পরামর্শ অনুযায়ী আলেমদের থেকে জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তথাকথিত একদল ভাড়াটে মওলভীদেরকে খরিদ করে তাদের মাধ্যমে নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে কাফের, ওহাবী ও গোমরাহ আখ্যা দিয়ে ফত্‌ওয়া দেওয়াইয়া ব্যাপকভাবে প্রচার করতে লাগলেন। এমনকি মুসলমানদের একত্রে সমাবেশ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য মসজিদগুলো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। আর কিছু নামধারী মাওলানা ও মুসলিম জমিদারকে মোনাফেকী কায়দায় মুসলমানদের দলে যোগ দেওয়ায়। এর ফলে তারা নামধারী মাওলানা ও জমিদার মোনাফেকদের মাধ্যমে মুসলমানদের যুদ্ধের গতিবিধি, কোথায় কিভাবে যুদ্ধ করবে, কোথায় অবস্থান করবে ইত্যাদি সব ধরনের খবর পেয়ে যেত। অপরদিকে এই জমিদার মোনাফেকরা যুদ্ধের সময় সামনে থেকে খুব ভালোভাবে যুদ্ধ করত। ফলে শিখেরা অল্পতেই পিছু হটত। তাই খুব সহজেই কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমানগণ আরো অনেক স্থান দখল করে ফেলেন। যার ফলশ্রুতিতে জমিদার মোনাফেকরা অতি সহজেই যুদ্ধের পরামর্শকারীগণের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হল। এমনকি তাদের পরামর্শ মত যুদ্ধ করে কিছু স্থানও সহজেই দখল হয়েছে। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে শিখ ও ইংরেজদের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী বিশ্বাসঘাতক জমিদার মোনাফেকরা মুসলমানদেরকে রাত্রে বালাকোটের ময়দানে অবস্থান

করার জন্য পরামর্শ দেয়। সুতরাং নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী তার অনুসারীদেরসহ রাত্রে বালাকোটের ময়দানে অবস্থান নিলেন। বালাকোটের ময়দান ছিল পাহাড়ে ঘেরা। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস শিখ ও ইংরেজরা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হঠাৎ রাতের আঁধারে আধুনিক অস্ত্র দ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। মোনাফিক জমিদাররা সরে পরে। নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীসহ ১২০০ জন মাওলানা ও অগণিত মুসলমান ১৮৩১ সালের ৬ ই মে শাহাদাত বরণ করেন। বালাকোটের যুদ্ধের পর ইংরেজরা নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর অবশিষ্ট খলিফাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যাকে যেখানে পায় তাকে সেখানেই খতম করে। তাই তারই একজন বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা নেছার উদ্দীন তিতুমির ইংরেজদের সাথে বাঁশের কেল্লা যুদ্ধে ১৮৩১ সালের ১৯ শে নভেম্বর শাহাদাত বরণ করেন। আর হযরত মাওলানা শাহ সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীকে মৃত্যুদন্ডের ঘোষণা দেওয়া হয়। নবী-রাসুলদের যুগেও অন্যায়ভাবে অসংখ্য নবীদের হত্যা করা হয়েছে। এমনকি আমাদের বিশ্বনবীর যামানায় হাজার হাজার সাহাবা ধর্মযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সুতরাং নায়েবে নবীদের সময়ে ও এভাবে শাহাদাত বরণ করা আশ্চার্যের কিছু নয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর মুরিদ জৈনপুরীর মাওলানা কেরামত আলী সাহেব যুদ্ধে অর্থ ও সৈন্য পাঠাবার দায়িত্বে ছিলেন তাই তিনি সেজন্য বাংলাদেশে আসার সময় তার পীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে বললেন, হুজুর আমারতো ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা সমাপ্ত হল না। আল্লাহ না করুক, আপনি যদি যুদ্ধে শহীদ হন তাহলে আমার কি অবস্থা হবে ? আমি কার কাছ থেকে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করব। তখন তিনি বললেন, মাওলানা ইমাম উদ্দীনের কাছ থেকে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করিও। মাওলানা কেরামত আলী বললেন, হুজুর দয়া করে লিখে দেন। তাই তিনি তাকে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত মাওলানা ইমাম উদ্দীনের কাছে একটি চিঠি লিখে তৎকালীন প্রচলিত পন্থা অনুযায়ী পাঞ্জার ছাপ দিয়ে দিলেন।

আল্লাহর কি কুদরত বালাকোটের যুদ্ধে ১২০০ জন মাওলানাদের মধ্যে

ইমাম উদ্দীনই বেঁচে রইলেন। তাঁর গায়ে গুলি লাগার পর তিনি এমনভাবে মরার মত পরে রইলেন যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তিনি মারা গেছেন। ঘটনা তাই ঘটল। যুদ্ধ শেষে তিনি কাঞ্চনপুর নোয়াখালীতে ফিরে এসে নিজ বাড়িতেই মৃত্যু পর্যন্ত মানুষদেরকে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতে থাকেন। যুদ্ধের কিছুদিন পর হযরত মাওলানা কেরামত আলী ইল্‌মে তাছাওউফের বাকি শিক্ষা সমাপ্ত করার জন্য চিঠি নিয়ে কাঞ্চনপুরে নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা ইমাম উদ্দীনের কাছে যান। চিঠি পড়ে উভয়েই কিছুক্ষণ কান্নাকাটি ও দোয়া মোনাজাত করেন। তিনি তার কাছে ইল্‌মে তাছাওউফ শিখতে থাকেন। এক পর্যায়ে শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি মাওলানা কেরামত আলীকে খেলাফতি দিয়ে দেন। বহু ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যদিয়েও হেদায়েতের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে, ১৮৫৫ সালে কাঞ্চনপুর নোয়াখালীতে নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা ইমাম উদ্দীন ইন্তেকাল করেন।

নায়েবে রাসুল সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আর একজন খলিফা নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী যুদ্ধে অর্থ ও সৈন্য পাঠাবার দায়িত্বে থাকার কারণে তিনিও সরাসরি বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তাই তিনিও বেঁচে রইলেন। তিনি ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতে শুরু করলে ইংরেজরা তাকে মৃত্যুদন্ডের ঘোষণা দেয়। তাই বাধ্য হয়ে তিনি ছদ্মবেশে কাঠুরিয়া সেজে বন থেকে কাঠ এনে বাজারে বিক্রয় করা শুরু করেন।

এদিকে হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী ফতেহ আলী মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে প্রথমে তিনি অযোধ্যায় পদচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারি ও পরে তার পলিটিক্যাল পেনশন অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। তিনি প্রায়ই নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর কাছ থেকে কাঠ ক্রয় করার কারণে তিনি বুঝতে পারলেন যে, আসলে তিনি কাঠুরিয়া নন। পরে আস্তে আস্তে সবকিছু জানার পর তিনি তাঁর কাছে বা'য়াত গ্রহণ করে ইল্‌মে তাছাওউফ শিখতে থাকেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি তাকে খেলাফতি দিয়ে দেন। বহু পরিস্থিতির স্বীকার হয়েও হেদায়েতের কাজ করার পর ১৮৫৫ সালে নায়েবে রাসুল হযরত

মাওলানা শাহ্ সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী ইন্তেকাল করেন। খেলাফতি পাওয়ার পর নায়েবে রাসুল শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা ফতেহ আলী চাকুরি ছেড়ে দিয়ে গোপনে গোপনে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে ফুরফুরার হযরত আবু বকর সিদ্দিক তাঁর সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে বা'য়াত গ্রহণ করে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে শিক্ষা সমাপ্তি হলে তিনি তাঁকে খেলাফতি দিয়ে দেন। বহু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যদিয়েও হেদায়েতের কাজ করার পর নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী ফতেহ আলী ১২৯৩ সালের ২০ শে অগ্রহায়ণ ইন্তেকাল করেন।

ফুরফুরা দরবার শরীফ

খেলাফতি পাওয়ার পর ফুরফুরার নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে কৌশলে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতে থাকেন। ইহাতে কতকে তাঁকে কাফের বলে ফত্ওয়াও দেয়। এর ফলে পরিস্থিতি এরূপ হয়ে যায় যে, তাকে ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে প্রথমে কালেমা পাঠ করে ওয়াজ শুরু করতে হত।

হযরত মাওলানা হাতেম আলী ছিলেন একজন সত্যের সন্ধানী। তাই তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্তির পর হতেই ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার জন্য একজন নায়েবে রাসুল খোঁজতে ছিলেন। হঠাৎ ফুরফুরার নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক সাহেবের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে বা'য়াত গ্রহণ করে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করতে থাকেন। তিনি মাহফিলে যেতেন এবং পীরের এজাযত নিয়ে বর্ষাকালে পীরের অবসর সময়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে খাদেমের সাথে হিসাব করে নিজের ও উস্তাদের খোরাকি, হাদিয়া, বেতন ইত্যাদি যাবতীয় খরচ দিয়ে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করতেন এবং পীরের বাড়ির কাজ কর্ম করতেন ও পীরের খেদমত করতেন। এক পর্যায়ে শিক্ষা সমাপ্তি হলে তিনি তাকে খেলাফতি দিয়ে বাংলায় হেদায়েতের কাজ করার জন্য আদেশ দিয়ে দেন। দীর্ঘদিন হেদায়েতের কাজ করার পর নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চ শুক্রবার প্রায় ১০০ বছর বয়সে ফুরফুরা শরীফের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইতিহাসে পাওয়া যায় ফুরফুরার দরবারে তাঁর পর থেকে.....

জৈনপুরীর খান্দান

ইংরেজরা বুঝেছিল হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী অল্প বয়স্ক এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহে ব্যস্ত থাকার কারণে ইল্‌মে তাছাওউফের সঠিক শিক্ষা অর্জন করতে পারেন নাই। তাই খেলাফতি পেয়ে নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) যখন বাংলা-আসামের বিভিন্ন স্থানে হেদায়েতের কাজ করতে থাকেন তখন ইংরেজরা তাঁর প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন করে নাই। এভাবে সুদীর্ঘ ৫১ বছর ধরে বাংলা ও আসামের আনাচে-কানাচে দ্বীনের খিদমত করার পর নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) ১২৯০ হিজরীতে ৭৫ বছর বয়সে রোজ শুক্রবার রংপুর জিলার মুন্সিপাড়ায় ইন্তেকাল করেন।

তিনি ইন্তেকালের সময় তাঁর সুযোগ্য দুজন পুত্রকে খলিফা হিসেবে রেখে যান। (১) হযরত মাওলানা মোঃ হাফেজ আহম্মদ সাহেব ও (২) হযরত মাওলানা হাফেজ আবদুল আউয়াল সাহেব। নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা মোঃ হাফেজ আহম্মদ সাহেব ডায়াবেটিস রোগের রোগী ছিলেন, তাই তিনি বোটে থাকতেন। আর নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা হাফেজ আবদুল আউয়াল সাহেব স্থলপথে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতেন।

দীর্ঘদিন হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করার পর নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা মোঃ হাফেজ আহম্মদ সাহেব ১৩০৫ বাংলা ৬ ই মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ সদরঘাটে স্বীয় বোটে ৬৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আর নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা হাফেজ আবদুল আউয়াল সাহেব ১৩৩৯ হিজরীর ১২ ই শাওয়াল ইন্তেকাল করেন। ইতিহাসে পাওয়া যায় জৈনপুরীর খান্দানে তাদের পর থেকে ..... ।

দুধল দরবার শরীফ

নায়েবে রাসুল হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রহঃ) খেলাফত পাওয়ার পরে যখন মানবজাতির হাদি হিসাবে আবির্ভূত হন তখন অখণ্ড ভারত ও বাংলা ভারতে বৃটিশ খ্রিস্টানদের শাসন চলছিল। বৃটিশ খ্রিস্টানদের

পরবর্তী স্থান ছিল হিন্দুদের। রাষ্ট্রের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট ও অন্যান্য পোস্টে ছিল খ্রিস্টান ও হিন্দুগণ। মুসলমানগণের উপর শিক্ষা-দিক্ষায় এমন অধঃপতন নেমে এসেছিল যে, বহু মুসলমান হিন্দুদের মত ধূতি পরত, গলায় পইতা দিত, হিন্দুদের সাথে পূঁজায় যোগ দিত, লক্ষ্মীপূঁজা করিত। তৎকালীন সময় খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পাদ্রি, ঠাকুর ও পুরুহীতগণ প্রকাশ্যে সভা সমিতি করিয়া ইসলামের বিপক্ষে বুঝাইত। ফলে বহু অজ্ঞ মুসলমান সন্তান খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করিত।

নায়েবে রাসুল, মুজাদ্দিদে আ'জম, হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রহঃ) তাহাদের অনেকের সাথে বাহাছ করিয়া ইসলামের সৌন্দর্য ও ইসলামই যে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম তাহা সমাজের সামনে ফুটাইয়া তুলেন। ফলে অনেকে মুসলিম ধর্মে পুনঃ ফিরে আসে। এরই প্রেক্ষাপটে তিনিঃ

❑ নাস্তিকদের লেখনীর দাঁত ভাঙা উত্তর প্রদান করেন। যথা- "নাস্তিকতার প্রতিরোধ"। ❑ আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যাহারা ধর্ম নিয়া হাসি ঠাট্টা করিয়া থাকে এবং আলেম, পীর মাদ্‌রাসা, পর্দাপ্রথা, সুন্নতি লিবাস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিপক্ষে পুস্তক লিখিয়া ছিল, তাহাদের বিপক্ষে "দূরমুজ চূর্ণ" নামে বই লিখেন। ❑ পূর্ণাঙ্গ ইসলাম যাহাতে মানব জাতি উপলব্ধি করিতে পারে এবং গোমরাহীর খপ্পর থেকে মানবদের কে উদ্ধার করার জন্য এজ্‌হারে হক, ইসলাম শিক্ষা, শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি বহু কিতাব বাংলা ভাষায় লিখেন। ❑ বিলুপ্ত ইল্‌মে ক্বলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ যাহা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ তাহা উদ্ধারের জন্য তাছাওউফ শিক্ষা নামে বাংলা ভাষায় ১৫ খন্ড কিতাব লিখেন। ❑ আল্লাহ্‌র বন্দেগী যাহাতে মানবজাতি জানিতে পারে এজন্য তিনি এবাদতে রুহানী, জেছমানী ও মালী নামে কিতাব লিখেন। ❑ তৎকালীন বৃটিশ খ্রিষ্টানদের শাসন হইতে মুক্ত হইয়া মুসলমানগণ যাহাতে স্বাধীন আবাসভূমি পাইতে পারে এজন্য বৃটিশ শাসনের বিপক্ষে বহু সংগ্রাম করেন। ❑ মুসলমান জাতির রাজনৈতিক দিকদর্শনের জন্য "রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র" নামে নয় খন্ড বই লিপিবদ্ধ করেন। ❑ কোরআন, হাদীস মতে তাবলীগ যে তিন প্রকার এ বিষয়ে "তাবলীগ" নামে পাঁচ খন্ড কিতাব লিখেন। ❑ কোরআন শরীফের সঠিক শিক্ষা মানবজাতি যাহাতে পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে

বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফের তাফসীর লিখে জান। ❑ ভন্ড ফকিরদের খপ্পর হইতে অজ্ঞ মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য "বেলায়েতপুরী উক্তি খন্ডন" নামে বই লিখেন। ❑ ইল্‌মে ক্বলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন এই কথা তৎকালীন সময় আলেম ও পীরগণ অধিকাংশই স্বীকার করিতেন না। এবং কতকে ইল্‌মে তাছাওউফের নামে শুধু জিকির অজিফা দিয়ে মানুষদেরকে ভুল বুঝাইতেন। তাহাদের সাথে শত শত বাহাছ করিয়া দলিল আদিল্লার মাধ্যমে ইল্‌মে ক্বলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা যে ফরজে আইন এবং তাছাওউফ যে নফল অজিফার নাম নহে, তাহা প্রমাণ করেন এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের প্রতিষ্ঠান সমূহ কায়েম করেন।

দীর্ঘদিন হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করার পর নায়েবে রাসুল মোজাদ্দেদে আ'জম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী মোঃ হাতেম আলী ছাহেব (রহঃ) ১৯৭৬ সালের পহেলা জুন, ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ বাংলা নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। বর্তমানে সাহেবজাদাগণ.....

আলিয়া রুলের মাদ্রাসা হতে ইলমে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইহিতাস

ইংরেজরা শত শত বছর পূর্বেই বুঝতে পারছিল যে, মুসলমানদের ভিতরে ইল্‌মে তাছাওউফের শিক্ষা ও আমল থাকার কারণেই তারা সর্ব বিষয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে তারা জজ ফজলুর রহমানের দ্বারা আরবী এহইয়ার ইংরেজীতে অনুবাদ করায়।

১৭৫৭-১৭৭০ এর মধ্যে আলেম ও ব্রেণী মুসলমানদেরকে ইংরেজরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কয়েকবার কচুকাটা করে পাইকারী ভাবে হত্যা করে ও তাদের শোষণের দ্বারা অনাহারে বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ অধিকাংশ মুসলমানদেরকে মেরে ফেলে এবং আকাইদ, ফিকাহ ও তাছাওউফের সমষ্টি শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম শিক্ষার বাংলার ৮০,০০০ (আশি হাজার) মাদ্রাসাকে বিভিন্ন কালো আইন করে ধ্বংস করার পর মুসলমান জাতি যাতে আর কোন দিন ইল্‌মে তাছাওউফের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সর্ব বিষয়ে সমুন্নত হয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উত্তোলন করতে না পারে,

সে জন্য শরীয়তের এক তৃতীয়াংশ মাছয়ালা ইলমে তাছাওউফের কিতাব সিলেবাস হতে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র আকাইদ ও ফিকাহের কিতাব সিলেবাস করে, আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষার জন্য ১৭৮১ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠা করে আলীয়া রুলের মাদ্রাসা।

আলিয়া মাদ্রাসায় যাতে ইল্‌মে তাছাওউফের কিতাব পাঠ্য করতে না পারে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে তাদেরই পরিকল্পনা অনুযায়ী আলিয়া মাদ্রাসাকে পরিচালিত করার জন্য দীর্ঘদিন যাবত ২৬ জন খ্রিষ্টান অধ্যক্ষকে দায়িত্বে নিযুক্ত রাখা হয়। আর বহুসংখ্যক খ্রিষ্টান মোহাদ্দেসদের দ্বারা পাঠ দান করানো হয়।

এক সময় ছাত্ররা বুঝতে পারল যে, আলিয়া মাদ্রাসায় ইল্‌মে তাছাওউফের কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই। সুতরাং তাদের ফরজে আইন ইল্‌মে তাছাওউফের শিক্ষা বাকী থাকতেছে। তাই ছাত্রদের মধ্য থেকে কতকে আলিয়া পাশের পর ফরজে আইন ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার জন্য তৎকালীন নায়েবে রাসুল শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) কাছে চলে যায়। তিনি তাদেরকে তার ছাত্র ও খলিফা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) নিকট পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেন। এভাবে একত্রিত হতে হতে এক পর্যায়ে মাওলানাদের সংখ্যাই হয় ১২০০ জন। যারা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ)-এর কাছে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার জন্য আসেন। তাই সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) তাদেরকে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দেন।

আর আলিয়ার কিছু ছাত্র আলিয়া মাদ্রাসাতেই ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার জন্য, ইল্‌মে তাছাওউফের কিতাব পাঠ্য করার জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ফলে বাধ্য হয়ে খ্রিষ্টান অধ্যক্ষ ইলমে তাছাওউফের কিতাব পাঠ্য করার জন্য আন্দোলন সংক্রান্ত ঘটনাবলী রাণীকে জানায়।

জবাবে রাণী বলেছিল ইল্‌মে তাছাওউফের শিক্ষাকে বিলুপ্ত করার জন্যই আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত ছাত্ররা ইলমে তাছাওউফের কিতাব পাঠ্য করার জন্য আন্দোলন করতেছে অথবা ভবিষ্যতে করবে তাদের নাম কেটে বহিষ্কার করুন, প্রয়োজনে কারাদন্ড দিন। ইহাতে মাদ্রাসায় ছাত্র পাওয়া না গেলে, প্রয়োজনে মাদ্রাসা বিরান থাকবে। বেতন

তো আমরাই দিচ্ছি। রানীর আদেশমত খ্রিষ্টান অধ্যক্ষ তাই করলেন। আর বললেন আমার উপর বিশ্বাস থাকলে মনে করবেন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতেছে। আর ছাত্ররাও আমাদের উদ্দেশ্য মতই গড়তেছে। পরবর্তীতে এই মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়।

ইংরেজদের শাসন, নিপীড়ন ও শোষণ আজ আর নেই সত্য। কিন্তু ইংরেজরা তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইল্‌মে তাছাওউফের কিতাব সমূহ পাঠ্য হতে বাদ দিয়ে, শুধু আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষার জন্য যে পাঠ্য করেছিল, আজ পর্যন্তও বর্তমান আলিয়া রুলের মাদ্রাসা সমূহে সেই পাঠ্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

এ জন্যই নায়েবে রাসূল, মোজাদ্দেদে আজম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ) এজহারে হক চতুর্থ খন্ডে লিখেছেন-"মুসলমানদের উপর যে, ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ তাহা ঈমানের ইলেমসহ তিন ভাগে বিভক্ত যথা-আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ। এই তিন প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করিলে দ্বীনি ইলেম শিক্ষার ফরজ আদায় হয়ে যায় এবং শরীয়াত মোতাবেক আলেম হওয়া যায়। কিন্তু আলিয়া রুলের মাদ্রাসাগুলিতে আকাইদ, ফিকাহ এই দুই প্রকার ইলেমের পাঠ্য কিতাব আছে। ইলমে তাছাওউফের ফরজ আদায় হয় এরূপ পাঠ্য কিতাব নাই। সুতরাং আলিয়া রুলের মাদ্রাসা পাশ করিলে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হয় না বরং ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার ফরজিয়াত বাকী থাকিয়া যায়। বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা গেল আলিয়া রুলের মাদ্রাসাগুলিতে শরীয়ত বা ইল্‌মে দ্বীনের আংশিক শিক্ষা হইতেছে"।

ইংরেজদের শাসন আমলে তাদের শোষণ ও নিপীড়নের ফলে না-হয় কিছুই বলা ও করা যায়নি। তাই আরবী শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য ইংরেজদের খুশী করে প্রাণ ও মান সম্মান রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে ইল্‌মে তাছাওউফের পাঠ্য বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষার পাঠ্যই মেনে নেয়া হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র কাছেও রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন তো আর সেরূপ কোন সমস্যা নাই। তাই আলিয়া মাদ্রাসা সমূহে আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষার সিলেবাসের সাথে ইল্‌মে তাছাওউফের কিতাব ও সিলেবাস করা প্রয়োজন। সুতরাং এখনও যদি ইল্‌মে তাছাওউফের

কিতাব পাঠ্য করা না হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কাছেও রেহাই পাওয়ার পথ থাকবে না।

তাই আলিয়া মাদ্রাসা পরিচালকদের নিকট জোর অনুরোধ রইল, যে শিক্ষার বদৌলতে অতীতের মুসলমান সর্ব বিষয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে আহোরণ করেছিল ইংরেজ কর্তৃক বিলুপ্ত সেই ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার কিতাব সমূহ আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষার কিতাবের সাথে সিলেবাস করে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য। যাতে মুসলমানগণ আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের সমষ্টি শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও আমল করে আখেরাতে নাজাত পেতে পারে এবং তাদের হারানো অতীতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ফিরে পেতে পারে।

আলেম ও মুসলিম নিধন করার জন্য হিন্দু ঠাকুরদের বিশেষ ফত্‌ওয়া

১৭৫৭ সাল হতে হিন্দুদের ঠাকুরেরা ফত্‌ওয়া দিয়ে আসতেছে যে, এক একটি গাভীর মধ্যে ৮৪ টি দেবতা। তাই গরুকে যারা কেটে ভক্ষন করে তারা হিংস্রপ্রাণী রাক্ষুস, তাদের নিধন করে ৮৪ দেবতা রক্ষা করা পুন্যের কাজ। সুতরাং এই ফত্‌ওয়া অনুযায়ী মুসলিম নিধনকে পুন্যের কাজ মনে করে মুসলমানদেরকে কচুকাটা করে পাইকারীভাবে হত্যা করে নিধন করতে থাকে।

হিন্দু ঠাকুরদের ফত্‌ওয়াটি অবিকল নিম্নে দেয়া হলঃ ফত্‌ওয়াটি বিভিন্ন ভাষায় দেয়া হয়েছিল তাই বাংলায় উহার অনুবাদ করে দেয়া হল। **ফত্‌ওয়াটির অনুবাদ হলঃ** এক একটি গাভীর ভিতরে ৮৪ টি দেবতা রয়েছে। এই গাভীর স্তনের দুধ প্রথমতঃ মুসলমান ভিখারীকে দেয়া হয়েছিল। তারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে বরং রাক্ষুস সেজে ৮৪ দেবতাসহ ঐ গাভী (গোমাতা) কেটে ভক্ষন করতে লাগল। তাই এই জালেম রাক্ষুসদেরকে হত্যা করে নিধন করে ৮৪ দেবতা ও গো মাতাকে যারা রক্ষা করবে, সৃষ্টি কর্তার নিকট তারা ধর্ম রাজা হিসাবে পুণ্যবান হবে। চতুস্পদ জানোয়ার গোমাতা পূঁজাকারী হিন্দুদেরকে মুসলমান নিধনের ব্যাপারে স্পৃহা বাড়াবার

উদ্দেশ্যে, ঠাকুরদের এই ফত্‌ওয়াটি অভিজাত শ্রেণীর প্রায় হিন্দুর ঘরেই টানানো থাকে। (দাঙ্গার সময় এই ফত্‌ওয়াটি হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। কিন্তু হিন্দু জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতি যাতে এই ফত্‌ওয়া সম্পর্কে জানতে না পারে সেজন্যও সর্তক করে দেয়া হয়।

কাশ্মীর এবং অন্যান্য স্থানে আলেম ও মুসলমান নিধনের ইতিহাস

এবার হিন্দুস্থানী শাসকগোষ্ঠী এবং তার বর্বর সেনাবাহিনী শ্রীনগর থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে ১৮ শ শতাব্দীর প্রখ্যাত সাধক শেখ নূর উদ্দীন ওয়ালীর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, মাজার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। জ্বালিয়ে দিয়েছে ১২ শত এর বেশী ঘরবাড়ী ও দোকান পাট। হত্যা করেছে অন্ততঃ ৩০ জন মোজাহিদকে। ভারতে গত ৪৮ বছরে তারা বিশ্ব ইতিহাসের নির্মমতম নিপীড়নের মাধ্যমে দশ লক্ষাধীক কাশ্মীরি মুসলমানকে হত্যা করেছে। বেইজ্জতি করেছে ২ লক্ষাধিক মুসলমান নারীকে। ভারতে বিগত ৪৮ বছরে ছোট বড় মিলিয়ে ২০ হাজারেরও বেশী মুসলিম বিরোধি দাঙ্গা বাজানো হয়েছে। এতে ২০ লাখেরও বেশী মুসলিম নিহত হয়েছে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে লাখ লাখ ঘরবাড়ী। ভারতের কোন সরকার কোন দিন কোন দাঙ্গাবাজ হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি।

ভারতে এ যাবৎ প্রায় ১ হাজারেরও বেশী মসজিদ ও মাজার হিন্দুরা দখল করে বাসস্থান ক্লাব কিংবা গোয়াল ঘর বানিয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২৭ শে মার্চ খোদ পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিধান সভায় তালিকা প্রদান করে দেখান যে, একমাত্র কোলকাতা শহরেই ৪৬ টি মসজিদ এবং ৭ টি মাজার উগ্র মৌলবাদী হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সময় শিবসেনা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। [দৈনিক সংগ্রাম ২য় পাতা ৬ ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ বাংলা, ২০শে মে ১৯৯৫ ইং, রোজ শনিবার]।

রনজিৎ এর রাজত্বকালে মুরক্রফট নামক জনৈক ইউরোপী পর্যটক কাশ্মীর সফরান্তে লিখেছিলেন "মুসলমানদের একত্রে সমাবেশ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য মসজিদগুলো পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে। বহু মুসলমানকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হচ্ছে। কাউকে বা রাস্তা দিয়ে টেনে হেচড়ে নিয়ে বেড়ানো হচ্ছে। গো জবাইয়ের মত নগণ্য অপরাধেও কোন মুসলিম পরিবারকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। শিখেরা পাঞ্জাবে আজান দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল জামাতে নামাজ পড়া তো দূরের কথা। *[কায়েদে আজম, লেখকঃ মোঃ আকবর উদ্দিন]*।

হুগলীতে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস

স্বাধীনতা যুদ্ধের ১৪ বছর পূর্বে ভারতের গভর্ণর জেনারেল বলেছিলেন "মূলতঃ মুসলমানরাই যে, আমাদের একমাত্র শত্রু এ বাস্তবতাকে উপক্ষো করা যায় না। তাই ইংরেজরা ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকেই সাধারণ মুসলমান এবং আলেম সমাজের উপর চালাতে থাকে অকথ্য নির্যাতন"। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ব্যর্থ হবার পর ভারতবর্ষে অত্যাচার ও নির্যাতনের যে বিভীষিকা নেমে আসে, মুসলমানগণই ছিল সে জুলুম ও অত্যাচারের মূল শিকার।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধে বিচারান্তে দু'লাখ মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছিল। তাদের মাঝে ওলামাই কিরামের সংখ্যাই ছিল ৫১,৫০০। আর বিনা বিচারে হত্যা ও ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল লাখ লাখ মুসলমান ও আলেমদেরকে। ইংরেজরা আলেমদের উপর এতই ক্ষেপা ছিল যে তারা যেখানেই কোন দাড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা ও লম্বা জামা ওয়ালা লোক দেখতে পেত, তার উপরই পাগলা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পরত এবং তাকে ফাঁসিতে ঝুলাতো। খাজা হাসান নিজামী লিখেছেন, "হাজার হাজার মুসলিম নারী ইংরেজদের পৈশাচিক নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের কুপে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেছে। অনেক পুরুষতো নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেছে। মূলতঃ তখন হুগলীর অলিগলি হত্যাকান্ডের লিলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। প্রতিদিন হুগলী নদীর স্রোতে হাজার হাজার মুলসামানদের লাশ ভেসে যেত। আর নরপিশাচ ইংরেজরা মনোরম উদ্যানে বসে মুলসমানদের লাশ দেখে আনন্দ উপভোগ করত। *[দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান, লেখক আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া]*।

থানা ভবনে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস

১৮৫৭ সালের মহান স্বাধীনতা আন্দোলন আপাত ব্যর্থ হয়। সাথে সাথে স্বাধীন থানা ভবন সরকারেরও পতন ঘটে। লাখো লাখো আলেমকে প্রকাশ্যে জবাই করে শহীদ করা হয়। দিনের পর দিন শহীদানদের লাশ গাছে লটকিয়ে রাখা হয়। শেরশাহ গ্রান্ড ট্যাংক রোডের কোন একটি বৃক্ষ

ছিলনা যেখানে শহীদানদের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়নি। আলেমদের কাউকে দেখলেই নির্বিচারে হত্যা করা হত। যেখানে এই অবস্থা ছিল যে, কোন মুসলিম ঘর আলেম ছাড়া ছিলনা, সেখানে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, গ্রামকে গ্রাম খুঁজেও একজন আলেম পাওয়া যেতনা। এমনকি দাফন কাফন করার মতও লোক পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

[দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান, লেখক আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া]।

থানা ভবনের এলাকা উজার করে দেয়া হলো। বিচারের কোন রূপ অপেক্ষা না করে ভারতের অন্যান্য এলাকার মত এখানেও প্রকাশ্য রাস্তায় নির্মমভাবে মুসলমানদের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হল। উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারদের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২৭/২৮ হাজার মুসলমানদেরকে বিনা বিচারে ফাঁসি দেয়া হয়েছে এবং প্রায় সাতশ' বিশিষ্ট আলেমকে (থানা ভবনের রাস্তার দু'পাশের গাছে) ফাঁসি কাষ্ঠে শাহাদাৎবরণ করতে হয়েছে। এছাড়া বহু ওলামা আন্দামান প্রভুতি দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছে। এক থানাভবন এলাকাতে যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ও আলেম শহীদ হয়েছেন, সে হিসাবে গোটা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় কি পরিমাণ মুসলমান ও আলেমকে শহীদ করা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এক হিসাব অনুযায়ী আজাদী পর্যন্ত বিচারান্তে বিশ লক্ষ মুসলমান জিহাদে দুশমনদের হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন। আর বিনা বিচারেও লাখো লাখো মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

[আজাদী আন্দোলন আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা লেখকঃ বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি]।

আলেম ও মুসলমানদের প্রতি অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস

ইংরেজদের অর্থনৈতিক আগ্রাসনের ফলে মুসলমানদের যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে সৈয়দ আহমদ বলেন-"দৈনিক দেড় আনা অথবা আধাসের শস্যের বিনিময়ে একজন ভারতীয় স্বেচ্ছায় স্বীয়গর্দান কর্তন করতে প্রস্তুত ছিল"।

মুসলমানদেরকে জমিদারী থেকে উচ্ছেদ করে তাদের নিঃস্ব করা

হয়েছিল। উচ্চ পদস্থ সরকারী পদগুলো থেকে মুসলমান কর্মকর্তাদেরকে অপসারিত করা হয় এবং নতুন লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন সব নতুন নতুন শর্তারোপ করা হয় যাতে মুসলমানদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এভাবে সকল সরকারী চাকুরীর সুযোগ সুবিধা থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত করে তাদেরকে বেকারাত্ব ও অর্থনৈতিক দেওলিয়াত্বের চরম পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হয়।

ডব্লিউ এস ব্লিন্ট বলেন-"আমরা যদি লুটপাতের এ ধারাকে আব্যাহত রাখি তাহলে এমন এক সময় আসবে যখন ভারতীয়রা বাধ্য হয়ে একে অপরকে ভক্ষণ করবে"। *[দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান, লেখক আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া]।*

আলেম ও মুসলিম নিধনের জন্য ইংরেজদের একটি কৌশল

বেনিয়া বৃটিশ সামজ্রবাদীরা স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর সাথে সাথে একদল পদালোহী খোশামোদে গোষ্ঠী তৈরির প্রয়াস চালায়, যারা সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই দেশবাসীর জন্য কল্যাণকর বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী আলেমদের থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা একদল ভন্ডনবী ও ভাড়াটে মৌলভী খরিদ করে নেয় এবং তাদের মাধ্যমে সংগ্রামী আলেম সমাজের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনার প্রয়াসে মেতে উঠে। তাদেরকে রাসুল বিদ্বেষী, ওয়াহাবী ও কাফির বলে আখ্যা দেওয়া হয় এবং এ মর্মে ফত্ওয়া খরিদ করে তা সাধ্যরণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। "প্রায় ৫০,০০০ হাজার পুস্তক পুস্তিকা ছাপিয়ে দেশ-বিদেশে প্রচার করা হয়, মূলতঃ এসমস্ত বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল ইংরেজদের স্বপক্ষে এবং জিহাদের বিপক্ষে" এর ফলে লাখো লাখো মানুষ জিহাদের ধারণা ত্যাগ করে, যা কতক মোল্লাদের প্রচেষ্টায় তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল।

[দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান লেখক আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া]।

আলেম ও মুসলমানদেরকে হত্যার পদ্ধতি

পাষন্ড ইংরেজরা মুসলমানদের যখন হত্যা করত, তখন শুকরের চামড়ার মধ্যে ভরে সেলাই করে দিত এবং হত্যার পুর্বে শুকরের চর্বি গায়ে মাখিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিত। জোর করে তাদেরকে শুকরের গোস্ত খাওয়ায়ে দিত। লেফটেন্যান্ট মাজান্ডী লিখেছেন "একজন মুসলিম সিপাহীর মুখমন্ডল সংগিনের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। অতঃপর তাকে অল্প আগুনে ভুনা করা হয়। জলন্ত মানুষের দুর্গন্ধে আমার মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

[দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান, লেখক আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া]।

ঢাকায় আলেম এবং মুসলিম নিধন ও শোষণের ইতিহাস

(ইংরেজদের হত্যা ও ফাঁসি এবং শোষণের ফলে) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সুবে বাংলার এক কোটি অধিবাসী মৃত্যুবরণ করেছিল। ঢাকায় শহীদ ময়দানে (পূর্ব ভিক্টোরিয়া পার্কে) বহু মুসলমানদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছিল। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে আশি হাজার মুসলমানকে সামরিক বাহিনী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। হান্টার বলেছেন-"গত পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে বাংলার মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় পৃথিবী থেকে হয় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অথবা আমাদের শাসনাধীনে যে নতুন শ্রেণী সমাজ গড়ে উঠেছে তাদের চাপে ডুবে গিয়েছে"। ***[ইন্ডিয়ান মুসলমানস হান্টারঃ ১৫৭ পৃষ্ঠা]।***

ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলার সমস্ত শিল্প ধ্বংস করেছিল। ঢাকাই মসলিনের বিলুপ্তির ইতিহাস সর্বজনবিদিত ঢাকা নগরীর পূর্ব সমৃদ্ধির কথা আজ যেন স্বপ্নের ও অতীত। ১৮৪০ সালে স্যার চার্লস ট্রিভলন পার্লামেন্টের এক কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেছিলেন, "ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ১৫০,০০০ থেকে কমে গিয়ে ৩০,০০০ দাঁড়িয়েছে"। (জনসংখ্যা বাড়ার কথা কিন্তু ইংরেজরা মুসলিম নিধনের ফলে যা ছিল তার থেকেও কমে পাঁচ ভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে মুসলিম নিধন করা হয়েছিল)। আজ তা এক দরিদ্র ও ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়েছে এ শহরের দূর্দশা সত্যিই বড় নিদারুন। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত এবং পরবর্তীকালের সূর্যাস্ত আইন ও রিজাম্পশন প্রসিডিং এর আঘাতে মুসলমান জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা এবং সর্বপ্রকার ছোট বড় ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে কোম্পানী মুসলমানদের বঞ্চিত করেছিল। সরকারী চাকুরী অন্যান্য পেশা ও শিক্ষাক্ষেত্র থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করা হয়েছিল। ১৭৬৫-৬৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় আশি হাজার মুসলমানকে শুধু মাত্র সামরিক বাহিনী থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। (তাহলে অন্যান্য পদ থেকে কি পরিমাণ বিতাড়িত হয়েছিল তাহা সহজেই অনুমেয়)।

বাংলায় ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার রাজশক্তি ধ্বংস হয়েছিল তাই নয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের চরম অধঃপতন হয়েছিল। ইংরেজদের শোষণ ও নিপীড়নের জাতাকলে বাংলার মুসলমান কৃষক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। অথচ ইংরেজদের নেক নজরের ফলে বাংলার হিন্দুদের সমষ্টিগতভাবে ক্ষতিতো হয়ই নাই বরঞ্চ বিপুল লাভ হয়েছিল। ১৭৭২ শতাব্দের শ্রাবণ মাসের (৮৪ সংখ্যা) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (মুসলমান) প্রজাদের দন্ড দেওয়ার আঠারো দফা ফর্দ দেওয়া হয়েছে।

[কায়েদে আজম, লেখকঃ মোঃ আকবর উদ্দিন]

বিহার এবং গড়মুক্তশ্বরে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস

নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ১৯৪৬ সালে বিহারে প্রায় ৩০ হাজার (মুসলিম) লোক নিহত ও প্রায় ১৫০,০০০ (মুসলিম) লোক বাস্তহারা হয়েছে। আয়ান ষ্টিফেন্স লিখেছেন ডেরাইসমাইলখান ও টাঙ্কের দাঙ্গার পূর্বে একদল মুসলমান ব্যবসায় বিহার ফিরছিল; একটা নির্জন স্থানে ট্রেন থামিয়ে হিন্দুরা তাদের হত্যা করে। ১৯৪৬ সালের ৬ই নভেম্বর থেকে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত গড় মুক্তেশ্বরে মুসলিম নিধন যজ্ঞ চলে। গঙ্গাতীরে হিন্দুদের পবিত্র মেলায় অনেক স্থান থেকে মুসলিম ব্যবসায়ীরা জমায়েত হয়। আকস্মিকভাবে আক্রমন করে মেলার সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করা হয়। তারপর গড়মুক্তশ্বর শহরে প্রবেশ করে তথাকার সকলকে হত্যা করা হয়।

টুকার লিখেছেন, "মীরাটের বাসিন্দা জনৈক হিন্দু কর্মচারী আমার একজন

অফিসারকে বলেছিলেন যে, তিনি এই হত্যা পরিকল্পনা সম্বন্ধে আগেই জানতেন এবং তার বন্ধুদের মেলায় যেতে নিষেধ করেছিলেন।

[কায়েদে আজম, লেখকঃ মোঃ আকবর উদ্দিন]।

কোলকাতায় এবং বিভিন্ন স্থানে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস

১৯৪৬ সালে বিহার, শরীফ, ছাপরা, ফতোয়াজুথলি, বিকাতপুর, খয়রা কঞ্চিপুর, বড়াকান্দি, হিল্‌সা প্রভৃতি অঞ্চলে পাইকারীভাবে মুসলিম নিধন হয়। ৫ থেকে ১৫ হাজার হিন্দু জনতা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত মুসলিম গ্রামসমূহ আক্রমন করে তাদের হত্যা করে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।

১৯৪৬ সালের ১৬ ই আগস্ট কোলকাতা ও নিকটবর্তী স্থানসমূহ থেকে প্রায় লক্ষাধিক মুসলিম বিভিন্ন দিক থেকে মিছিলসহ এসে গড়ের মাঠে অক্‌টারলনী মন্যুমেন্টের সামনে সমবেত হয়েছিল। সভা ভঙ্গের পর জনতা মিছিলসহ ফিরে যাওয়ার পথে হাঙ্গামা শুরু হয়। এই হাঙ্গামায় হতাহতের সংখ্যা ৫০,০০০।

[কায়েদে আজম, লেখকঃ মোঃ আকবর উদ্দিন]

লাখনৌ, কোলকাতা এবং লাহোরে আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস

লাখনৌ দখলের পরবর্তী পরিস্থিতি সম্বন্ধে লেঃ মেজন্ডি লিখেছেন যে, "সেখানে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল সিপাহী হউক বা আওয়াধের (অযোধ্যা) পল্লীবাসীই হউক কোন পার্থক্য করা হয়নাই। কালো চামড়া হলেই হল; সিপাহী বিপ্লবের পর কলিকাতা থেকে লাহোর পর্যন্ত শেরশাহী রাস্তার দু'ধারে নির্বিচারে মুসলিম বাসিন্দাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

জেনারেল নীল ১৮৫৭ সালের মে মাসে একটি রেজিমেন্টসহ বানারস ও এলাহাবাদের দিকে যাওয়ার সময় মেজর রেনডকে লিখিত হুকুম দিয়েছিলেন যে, "পথের উভয় পার্শ্বে শত্রু অধিকৃত সমস্ত স্থান অধিকার করে ধ্বংস করতে হবে"।

রেনড উপর ওয়ালার হুকুম তামিল করার জন্য সৈন্যসহ ক্রমাগত তিনদিন ধরে এগিয়ে চললো। পশ্চাতে রেখে গেল ইংরেজদের প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তির চিহ্ন জনহীন গ্রামসমূহ ও গাছের ডালে ঝুলান্ত লাশ। যেখানে রেনড থেমেছে সেখানেই সমস্ত গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে।

[কায়েদে আজম, লেখকঃ মোঃ আকবর উদ্দিন]

দিল্লিতে আলেম এবং মুসলিম নিধন ও শোষণের ইতিহাস

১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর দিল্লীর জামে মসজিদের আঙ্গিনায় একদিনেই ইংরেজরা বিচারান্তে ২৭ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে আর বিনা বিচারেও লাখো লাখো মুসলমানদেরকেও হত্যা করে অথবা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলায়। এডওয়ার্ড টমাস বলেন, "শুধু দিল্লীতেই ৫০০ আলিমকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল"।

[দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান, লেখক আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া।]

১৮৫৭ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হওয়ার পর দিনের অবস্থা সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ লিখেছেন "আমাদের সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করার পর নগর প্রাচীরের মধ্যে যাকে পেয়েছে তাকেই বেয়োনেটের আঘাতে হত্যা করেছে"। জি,ও,ট্রেভোলিন ঐ সময় দিল্লীতে ছিলেন। বিপ্লবের অল্পদিন পরে তিনি লিখেছেন। "দিল্লী দখল করার পর গাজী নামক একটি উৎসাহী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এমন একাধিক ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়েছিল যাদের চেহারা সম্ভবতঃ আমাদের ধর্মবিরোধী একটি সম্প্রদায়ের লোকের মত দেখাতো।

১৭৫৭ সালের পূর্ব থেকে ইংরেজরা মুসলমানদের প্রধান দুশমন বলে মনে করতো। সৈয়দ আহমদ শহীদের মোজাহিদ আন্দোলন ও সংগ্রাম বাংলার ফরায়েজী আন্দোলন ও তিতুমীরের সংগ্রাম এবং সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী মুসলমানদের একটা বিরাট অংশে অসন্তষ্টি ইংরেজ মুসলমান বিরোধী মনোভাব কঠোর করে তুলেছিল। এর পর ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ইংরেজকে পাইকারীভাবে মুসলিম হত্যার সুযোগ দিয়েছিল এবং তারা এই সুযোগের পূর্ন ব্যবহার করেছিল।

[কায়েদে আজম, লেখকঃ মোঃ আকবর উদ্দিন]।

এই সময় মুসলমানদের উপর অত্যাচার সম্মন্ধে জাফর থানেশ্বরী লিখেছেন "যাকে ইচ্ছা খেয়াল খুশীমত শাস্তি দিতে লাগিলেন এবং শত শত মুসলমানদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। ১৮৬৩ সালের শেষ ভাগ থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত ভারতের মুসলমানদের উপর কেয়ামতের আজাব চালু রাখলেন। হাজার হাজার মুসলমান শুধু প্রাণের ভয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে আরব প্রভৃতি দেশে হিজরত করে চলে গেল"। তিনি আরও লিখেছেন "১৮৭২ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত পাটনা ও বাংলার নিরাপরাধ মুসলমানদের গ্রেপ্তার কার্য অব্যাহত রাখা হল"। [আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী]।

সিপাহী বিপ্লোবোত্তর সীমাহীন নির্যাতন ও বিশিষ্ট জ্ঞান সাধকগণকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান অথবা আন্দামানে নির্বাসিত করার মাধ্যমে জ্ঞান সাধনার পথ নির্মূল করিয়া দেওয়া হয়। বিশিষ্ট আলেমগণকে ধরিয়া নির্বিচারে হত্যা অথবা আন্দামানে নির্বাসিত করিয়াই সাম্রাজ্য লোলুপ বৃটিশ শক্তি শান্ত হইতে পারে নাই। বেনিয়া বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া তাহারা এই দেশের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থকার এমনকি পারিবারিক গ্রন্থকারও লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে চালান দেয়। তাহা ছাড়া ব্যাপক লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের সময় যে কত মূল্যবান লাইব্রেরী ও পান্ডুলিপির সংগ্রহ বিনষ্ট হইয়া যায় তাহারও ইয়াত্তা নাই।

দেওবন্দ রুলের মাদ্রাসা হতে ইলমে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইতিহাস

১৮৬৬ সালের পূর্বাপর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ বানচাল হওয়ার পর বৃটিশ সরকার মুসলমানদের থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পুরাভাবে দাদ নেয়। যার ফলশ্রুতিতে ইংরেজরা দাড়ি, টুপি ও লম্বা জামা ওয়ালা মানুষ দেখলে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পরে লাখো-লাখো আলেম ও মুসলমানদেরকে হত্যা করে অথবা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলায়। শত শত মসজিদকে মন্দির ও গীর্জায় রূপান্তারিত

করে। শত সহস্র আকাইদ, ফিকাহ ও তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা সমূহকে কালো আইনের দ্বারা বিলুপ্ত করে। এহেনো মুহূর্তে বৃটিশ সরকারের সাথে যোগাযোগ না রেখে কারো পক্ষে কোন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার কোনরূপ সাধ্য ছিল না। এ কারণেই ইংরেজদের খুশি করার জন্য তাদেরই প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ন্যায় ইল্‌মে তাছাওউফের পাঠ্য বাদ দিয়ে শুধু মাত্র আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষার পাঠ্য করে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ভারত বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসা। কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যের ন্যায় দেওবন্দ মাদ্রাসাসমূহেও পাঠ্য করে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিনা এজন্য ইংরেজরা আকস্মিকভাবে বার বার পরিদর্শন করতো। এমনকি সর্বদা গোয়েন্দা বিভাগও এ বিষয়ে তদন্ত করত।

ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্টার "জন পামর" তার রিপোর্টে দাবি করে বলেছেন, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, যদি কোন অমুসলিম ও এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে তাহলে সে যথার্থ ভাবেই উপকৃত হবে। শিক্ষা সিলেবাস এতটাই ব্যাপক ছিল যে, হিন্দু ছেলেরাও সে প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করত বলে "তারিখে দারুল উলুমে" উল্লেখ রয়েছে।

[দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান, লেখক আবুল ফাতাহ মোঃ ইয়াহইয়া ১৫০ পৃষ্ঠা]

ইউপি গভর্ণর স্যার স্টিচি তার একান্ত বিশ্বস্ত জন পামরকে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে দেওবন্দ প্রেরণ করেন। তিনি দেওবন্দ এসে তথ্য সংগ্রহের কর্তব্য কাজ আদায় করার পর স্যার স্টিচিকে দেয়া প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন আমার অনুসন্ধানের ফলাফল হচ্ছে।

এই খানকার মানুষ শিক্ষিত, সৎ চরিত্রবান এবং সুস্থ স্বভাবের সু অধিকারী। এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাই যা এখানে পড়ানো হয় না। যে কাজ বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাধা করা হয় তাহা এখানে অতি স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন করা হয়। মুসলমানদের জন্য এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। আমি অকুণ্ঠচিত্তে এতটুকু বলতে পারি যে, যদি কোন অমুসলিমও এখানে শিক্ষার্জন করে তাহলে সেও উপকৃত হবে। আমার দুঃখ যে, আজ স্যার ইউলিয়াম মেয়র এই স্থানে উপস্থিত

নেই। যদি তিনি এখানে থাকতেন এবং এসব পর্যবেক্ষণ করতেন তাহলে অত্যন্ত মুগ্ধ হতেন এবং খুশী হয়ে ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করতেন। [মাওলানা সৈয়দ মাহবুব রেজবীর লিখিত "তারিখে দারুল উলুম"-১৮১ পৃষ্ঠা]।

প্রকাশ থাকে যে, দেওবন্দ মাদ্রাসা সমূহে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসার ন্যায় ইল্‌মে তাছাওউফের সিলেবাস বাদে শুধু মাত্র আকাইদ ও ফিকাহের সিলেবাস থাকার কারণেই যেই ইংরেজরা বিভিন্ন কালো আইন করে মাদ্রাসা বিলীন করেছে সেই ইংরেজরাই দেওবন্দ মাদ্রাসা পরিদর্শন করে প্রশংসা করেছে।

ইংরেজদের শাসন-নীপিড়ন ও শোষণ আজ আর নেই সত্য কিন্তু ইংরেজদের শাসন আমলে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদ্রাসা ইংরেজদের খুশী রাখার জন্য ইংরেজ সরকারের প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসার ন্যায় ইল্‌মে তাছাওউফের সিলেবাস বাদ দিয়ে শুধু আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষার যে সিলেবাস ছিল আজ পর্যন্ত ও বর্তমান দেওবন্দ মাদ্রাসা সমূহেও সে সিলেবাসের ধারাই অব্যাহত রয়েছে। এই জন্যই নায়েবে রাসুল, মোজাদ্দেদে আ'জম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ) এজহারে হক চতুর্থ খন্ডে লিখেছেন-মুসলমানদের উপর যে, ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ, তাহা ঈমানের ইলেমসহ তিন ভাগে বিভক্ত যথা-আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ। এই তিন প্রকার ইলেম শিক্ষা করিলে দ্বীনি ইলেম শিক্ষার ফরজ আদায় হয়ে যায় এবং শরীয়াত মোতাবেক আলেম হওয়া যায়। কিন্তু দেওবন্দ রুলের মাদ্রাসাগুলিতে আকাইদ, ফিকাহ এই দুই প্রকার ইলেমের পাঠ্য কিতাব আছে। ইলমে তাছাওউফের ফরজ আদায় হয় এরূপ পাঠ্য কিতাব নাই। সুতরাং দেওবন্দ রুলের মাদ্রাসায় পাশ করিলে ইলমে দ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হয় না বরং ইলমে তাছাওউফ শিক্ষার ফরজিয়াত বাকী থাকিয়া যায়। বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা গেল দেওবন্দ রুলের মাদ্রাসাগুলিতে শরীয়াত বা ইলমে দ্বীনের আংশিক শিক্ষা হইতেছে।

ইংরেজদের শাসন আমলে তাদের শোষণ ও নিপীড়নের ফলে না-হয় কিছুই বলা ও করা যায়নি। তাই আরবী শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য, ইংরেজদের খুশী করে প্রাণ ও মান সম্মান রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে ইল্‌মে তাছাওউফের পাঠ্য বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আকাইদ ও ফিকাহ্ শিক্ষার

পাঠ্যই করা হয়েছিল। তাই আল্লাহ্‌র কাছেও রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন তো আর সেরূপ কোন সমস্যা নেই। তাই দেওবন্দ মাদ্রাসা সমূহে আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষার সিলেবাসের সাথে ইলমে তাছাওউফের কিতাব ও সিলেবাস করা প্রয়োজন। সুতরাং এখনও যদি ইলমে তাছাওউফের কিতাব পাঠ্য করা না হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কাছেও রেহাই পাওয়ার পথ থাকবে না।

তাই দেওবন্দ মাদ্রাসা পরিচালকদের নিকট জোর অনুরোধ রইল, যে শিক্ষার বদৌলতে অতীতের মুসলমান সর্ব বিষয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, ইংরেজ কর্তৃক বিলুপ্ত সেই ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার কিতাব সমূহ আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষার কিতাবের সাথে সিলেবাস করে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য। যাতে মুসলমানগণ আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের সমষ্টি শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও আমল করে আখেরাতে নাজাত পেতে পারে এবং তাদের হারানো অতীতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ফিরে পেতে পারে।

(নির্যাতিত আলেমদের মধ্য থেকে শুধু মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদীর প্রতি নির্যাতনের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে)-

অত্যাচার করিয়া আমার দুইটি হাতই প্রায় বেকার ও দুর্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্ভব-অসম্ভব সকল প্রকার নিপীড়নের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে ও আমার পরিজনকে নিস্তার দেওয়া হয় নাই। নিষ্ঠুর কারার অন্তরালে এমন কোন অত্যাচার নাই যাহা আমার উপর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। কেন আমার প্রতি এই উৎপীড়ন ? কিইবা আমার অপরাধ ? আমার একমাত্র অপরাধ আমি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম, তদুপরি লোকে আমাকে একজন আলেম বলিয়া মনে করে আর এলমে দ্বীনের সহিত আমার আত্মার সম্পর্ক। এই আচরণের গূঢ় তাৎপর্য হইল, এই জালেমেরা আমার প্রিয় জন্মভূমি হইতে এলেম ও এলমে দ্বীনের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলিতে চায়। শাসক শ্রেণী সর্ব প্রকার ধর্মীয় চেতনার বিলুপ্তসাধন করার জন্য নানা প্রকার জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হন। প্রাচীন মক্তব, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য

বিদ্যালয়গুলি ধ্বংস করার কার্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে নানা প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে থাকেন। মুসলমানদিগকে তাহারা খত্‌না করাতে নিষেধ করে পর্দানশীন মহীলাদের বেপর্দা ও বে-হায়া করিয়া তোলার জন্য নানা ধরণের প্রভাব বিস্তার এবং সরকারী চাপ প্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত প্রকার পন্থা অবলম্বন করে। শহরটিতে (দিল্লী) প্রাণ ভরিয়া লুটপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল। শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের মধ্যে যাহারা তখন পর্যন্ত অন্যত্র পলায়ন করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ইংরেজরা নির্বিচারে হত্যা করিয়া যাইতে লাগিল। দেশের শাসনকর্তা বলিয়া পরিচিত বৃদ্ধ বাদশাহ ও বেগমকে সপরিবারে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় শহরে আনা হল। পথিমধ্যে হাডসন নামক এক সেনা নায়ক বাদশাহ তনয়ও পৌত্রকে গুলি করিয়া হত্যা করিল। জালেমেরা শাহাজাদাদ্বয়ের মৃতদেহ পথিপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া মস্তক কর্তন করিয়া আনিল এবং একটি সুসজ্জিত পাত্রে স্থাপন করতঃ বাদশাহের সম্মুখে উপহারস্বরূপ পেশ করিল। তৎপর মস্তক দুইটিও চুর্ণ ও বিচুর্ণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। বাদশাহের পরিবার-পরিজনের যাহাকেই হাতে পাইত মনুষ্যত্ব বিবর্জিত ইংরেজ জালেমরা নির্বিচারে হত্যা করিত অথবা অন্যান্য অসংখ্য দেশপ্রেমিক নাগরিকের ন্যায় ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইত। এত করিয়াও তাহারা নিরস্ত হইল না, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের পর্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করিতে লাগিল। সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে সেনা নায়কদের সম্মুখে পেশ করা হইত। সেনানায়কগণ এই সমস্ত লোককে গুলি করিয়া হত্যা অথবা ফাঁসির নির্দেশ দিত। এইভাবে ফাঁসি কাষ্ঠে আত্মদানকারী অথবা গুলির সম্মুখে প্রাণ ত্যাগকারীর সংখ্যা হাজার হাজারের কোঠায় যাইয়া দাঁড়ায়, তাহাদের অধিকাংশ ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলমান নাগরিক। মুসলমানদের মধ্যে মাত্র তাহারাই পরিত্রাণ পাইয়াছিল যাহারা কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। এই গণহত্যার পৈচশিকতা শুধু দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চতুর্দিকে হিন্দু জমিদার ও অমাত্য শ্রেণীর নিকট নির্দেশনামা প্রচার করিয়া দিল যে, যে কোন সন্দেহজনক লোককে গ্রেপ্তার করিয়া যেন দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। এ নির্দেশের ফলে হাজার হাজার পলায়নকারী দেশপ্রেমিক গ্রেপ্তার হয় এবং গণহত্যার শিকারে পরিণত হয়। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা কোন

সাধারণ লোকের পক্ষেই এই অভিযানের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। অধিকাংশ স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়া বর্ণনাতীত নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। অনেক বিশিষ্ট লোকের কন্যাকেও জালেমরা সেবাদাসী বা রক্ষিতার জঘন্য জীবন গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। কত শরীফ ঘরের মা, বোনকে যে, ইহারা গরু ছাগলের ন্যায় হাটে বাজারে বিক্রয় করে, তাহার ইয়াত্তা নাই। কত নারী ও শিশু যে নিখোঁজ হয় তাহার কোন হিসাব নাই। কত নারী, শিশু ও বৃদ্ধ লাচার লোক যে স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সর্বনাশের কবলে পতিত হয় তাহার হিসাবই বা কে জানে? সকাল বেলায় হয়ত যে নারী, ছিল স্বামী-পুত্রের সংসারের রাণী সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে না আসিতেই সে হইল নিঃসহায় বিধবা এবং কড়ার ভিখারী, যে সন্তান হয়ত রাত্রির বেলায় পিতার কোলে সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, সকাল হইতে না হইতেই দেখা গেল সে অনর্থ এতীমে পরিণত হইয়াছে।

দিল্লী ধ্বংস করিবার পর ইংরেজরা পূর্বদেশীয় শহর ও জনপদগুলির দিকে মনোযোগ দিল। সেই সমস্ত শহরেও দেখিত না দেখিতেই ব্যাপক ধ্বংসলীলা নামিয়া আসিল। ব্যাপক গণহত্যা ও বেপরোয়া লুণ্ঠন চলিল এবং ইংরেজ সেনারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিককে ধরিয়ে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতে লাগি অগনিত মানুষ গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। এদেশের হাজার হাজার শিক্ষিত, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপত্তা ও ক্ষমার ওয়াদা করার পর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হয় অথবা আজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। পূর্বে অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা রক্ষা না করিয়া অসংখ্য মুসলমানদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়। কত সুন্দর বাড়ী-ঘর, সুসজ্জিত বাগান এবং মূল্যবান আসবাবপত্র যে বর্বর গোরা সৈন্যরা ধ্বংস করিয়া ফেলে তাহার ইয়াত্তা নাই। এইভাবে যেসমস্ত লোককে নির্যাতন অথবা হত্যা করা হয়, সাধারণভাবে গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নিরূপন করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না।

হাজার হাজার কারাদন্ড ও নির্বাসন আলেমদের মধ্য থেকে উদহারণ হিসাবে শুধুমাত্র মাওলানা ফজলে হক্ খয়রাবাদীর কারা ও নির্বাসন জীবনের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা তিনি লিখেছেন।

জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী আমাকে বাড়ী হইতে ডাকাইয়া নিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। এই কঠোর বন্দী জীবন শুরু হওয়ার পরই আমাকে রাজধানীতে (লাক্ষনৌ) পাঠাইয়া দেওয়া হইল। জালিম বিচারক আমাকে আজীবন কারাদন্ড ও নির্বাসনের নির্দেশ দেয়। আমার অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন লাভ করিতে থাকে। আমাকে বন্দী অবস্থায় এক কয়েদখানা হইতে অন্য কয়েদখানায় এক প্রান্তর হইতে অন্য প্রান্তরে এবং নির্যাতনের এক অধ্যায় হইতে অন্য এক অধ্যায়ে লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা আমার পায়ের জুতা ও পরনের রূচিসম্মত পোশাক খুলিয়া ফেলে। অতঃপর নগ্নপদে এবং জঘন্য প্রকারের মোটা বস্ত্রে কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করার ব্যবস্থা করা হয়। আমার পরিচ্ছন্ন কোমল শয্যা ছিনাইয়া লইয়া শক্ত, কষ্টদায়ক ও দুর্গন্ধযুক্ত শয্যা দেওয়া হয়। সেই শয্যার কথা বর্ণনা করার ভাষা আমার নাই। সম্পূর্ণ শয্যায় যেন কন্টক পুতিয়া রাখা হইয়াছিল। সামান্য একটি লোটা, পেয়ালা, সাধারণ ব্যবহারোপযোগী একটি বরতন (বাসন) পর্যন্ত আমাকে দেওয়া হয় নাই। সিদ্ধমাছ খাদ্য হিসাবে দেওয়া হইত। আর পান করিতে দেওয়া হইত গরম পানি। হায়রে স্বদেশপ্রেম! জনতার ভালবাসা আমরা পাইলাম না। এই বার্ধক্যের দিনগুলিতে সেবাযত্নের জন্য উন্মুখ আমার এই দেহ-মন পাইল জিন্দান খানার তপ্ত পানি। স্নেহ-মমতার শীতলতা হইতে আমরা রহিলাম দূরে, বহু দূরে। তার পরিবর্তে অনবরত আমাদিগকে নির্যাতন অপমান ও মানবতা বিরোধী আচরণ সহ্য করিতে হইতেছে।

অতঃপর কুদর্শন দুশমনের জুলুমের শিকার হইয়া আমি নীত হইলাম কালাপানির পার্বত্য এলাকায়। এই স্থানের আবহাওয়া মারাত্মক, সর্বদা যেন মাথার উপর তপ্ত সূর্য্য অগ্নিবর্ষণ করিতে থাকে। এই মরন দ্বীপের কোথায়ও পথঘাটের নামগন্ধও নাই। দুর্গম বন্ধুর পথঘাটে সর্বদা হিংস্র

প্রাণীর খেলা চলিত। এই বিচরণ স্থানও আবার মাঝে মাঝে লোনা পানির ঢেউ আসিয়া প্লাবিত করিয়া দেয়, আর রাখিয়া যায় শুধু লবণাক্ত কর্দম ও বিষাক্ত পলিমাটি। এ স্থানের প্রাতঃকালীন বায়ুও 'লু'র ন্যায় গরম এবং ভয়াবহ। এখানকার অমৃতও হলহলের চাইতে মারাত্মক। এস্থানের খাদ্য মানুষের উপযোগী নয়। এই দ্বীপের পানি সাপের বিষের চাইতে ও মারাত্মক ও ভয়াবহ। এই দ্বীপের আকাশ হইতে যাতনার বৃষ্টি ঝরে। এই দ্বীপের মেঘমালা শুধু নির্যাতন ও দুশ্চিন্তার বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় এই দ্বীপের মাটি সূচাগ্রসদৃশ তীক্ষ্ণধর এবং ইহার কঙ্করপূর্ণ বাতাস অপমান ও লাঞ্ছনার পয়গাম বহন করিয়া আহাজারী করিয়া ফিরে। আমাদিগকে অপ্রশস্ত অন্ধকার কুঠ'রীতে বন্দী করা হইল। ঘরগুলির উপরে ছাদ আছে সত্যই, কিন্তু বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই নয়নের অশ্রুধারার ন্যায় বৃষ্টিধারা সমগ্র ঘরটি প্লাবিত করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস দুগন্ধযুক্ত হইয়া উঠে এবং রোগের উৎপত্তি ঘটায়। ব্যাধি বিমারী এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইলেও ঔষধ এখানে দুষ্প্রাপ্য। অসংখ্য প্রকার গোরা নিত্যই আমাদেরকে আক্রমন করিতে আসে। কিন্তু তাহার প্রতিকার পন্থা আমাদের জানা নই। খুঁজলি, দাদ ও শরীরের স্থানে স্থানে ফোস্কা পড়া এখানে রোগের মধ্যেই গণ্য নয়। কিন্তু সামান্য একটু মলম বা মামুলী কোন ঔষধের সন্ধানও আমাদের নাগালের বাইরে। নামে মাত্র চিকিৎসকের ব্যবস্থা অবশ্য এখানে আছে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টায় রোগের উপশম না হইয়া বরং তাহা বর্ধিত হইতে থাকে। চিকিৎসকেরা নতুন নতুন দুঃখ-কষ্টের বার্তাবহ হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে বসিয়া একটু সান্তনার বাণী বা হৃদয় বিদারক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটুখানী সমবেদনা প্রকাশের জন্যও কোথাও কোন লোক পাওয়া যায় না। অবজ্ঞা, অবহেলা এবং কটুবাক্য বর্ষণ করিয়া দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করাই এই স্থানের রীতি। মানুষকে কষ্ট দিয়াই এখানে লোকে শান্তি পায়। এখানকার দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-শোকের সঙ্গে দুনিয়ার আর কোন দুঃখ-কষ্টের তুলনা হয়না। সামান্য একটু জ্বর এখানে মৃত্যুর পয়গাম লইয়া আসে। সাধারণ একটু সর্দিতেও মস্তিস্ক স্ফীত হইয়া অসহ্য ব্যাথার সৃষ্টি করে। এখানে এমন অসংখ্য রোগ নিত্যই আক্রমন করিয়া থাকে যার উল্লেখ পর্যন্ত কোন চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে নাই। ইংরেজ, নাসারা চিকিৎসকেরা রোগীদের

উপর নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার খড়গ চালাইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করে মাত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাত্রে পরিণত হইয়া কত লোকের যে মস্তিস্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কতলোক যে চিরতরে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই। রোগ না চিনিয়া ঔষধ দেওয়া এবং নতুন-নতুন ঔষধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর ফলে যাহারা অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তাহাদের মত্যু দেহ কাটিয়া দেখা হয়। তারপর শয়তানের দোসর নিকৃষ্ট ডোমদের হাওলা করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা পবিত্র লাশের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং নদীতে ফেলিয়া দেয় অথবা কোন পথের ধারে অথবা বালির স্তুপের নীচে শৃগাল কুকুরের জন্য রাখিয়া দেয়। দাফন-কাফন বা জানাজার কোন ব্যবস্থাই এখানে নাই। কি হৃদয় বিদারক আমাদের এই কাহিনী "মৃতের সাথে এই অমানুষিক ব্যবহার প্রতিনিয়ত চোখের সম্মুখে না হইলে সম্ভবতঃ মৃত্যু কামনাই এখানকার সকলের সর্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু হইয়া দাঁড়াইত, আর হঠাৎ মৃত্যুই হইত সবচাইতে বড় কামনার ধন। আত্মহত্যা যদি ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং আখেরাতে মহা আজাবের অবশ্যম্ভাবী কারণ বলিয়া নির্দেশিত না হইত, তবে এই নির্যাতনের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে বোধ হয় মৃত্যুর শীতল হাত বাছিয়া নেওয়ার পন্থাই সকলে অবলম্বন করিত। কারণ এহেন অমানুষিক নির্যাতন কেহই বরদাশ্‌ত করিতে চাহিত না। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যেই আমি নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিলাম। ফলে আমার ধৈর্যের সীমা ভাঙ্গিয়া পড়িল, অন্তর আমার সংকীর্ণ হইয়া আসিল, আমার ভাগ্যাকাশের চাঁদ যেন রাহুগ্রস্ত হইয়া গেল। যে সামান্য মান-মর্যাদা বোধ আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইতে বসিল। এখন আর ভাবিতেও পারি না যে, এই মহাবিপদ হইতে আত্মরক্ষার কোন পথ আদৌ খুঁজিয়া পাইব কিনা ? দাদ-খুজলী অসহ্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে। আমার সকাল-সন্ধ্যা নিদারুন কষ্ট ও ছটফটানির মধ্যে অতিবাহিত হয়। শরীর জখমের আধিক্যে জর্জরিত হইয়া গিয়াছে। প্রাণান্তকর ব্যাথা বেদনার মধ্যে আমার দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন যেন আরও অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। রোগের দাপট ও ক্রমে বর্ধিত হইয়াই বলিয়াছে। সেই সময় বোধ হয় আর বেশী দূরে নয়, যখন এই খুঁজলী পাঁচড়ার নিদারুন যন্ত্রণা

আমাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। হায় ! এক সময় ছিল, যখন জীবনের এহেন সুখ-শান্তি নাই যাহা আমার আয়ত্তে ছিল না। আর আজ আমি বন্দী জীবনে তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এক যমানা ছিল, যখন আমার নিরুদ্বিগ্ন জীবন সুখী সমৃদ্ধ মানুষেরও হিংসার উদ্রেক করিত। আর আজ আমি বন্দীত্বের দারুন কষ্টের মধ্যে পংগু ও শক্তিহীন হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু মৃত্যুও আমাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে না। দুশমন জালেমরা আমাকে নিত্য নতুন দুঃখ-কষ্টে পতিত করিয়া ধ্বংস করিতে তৎপর রহিয়াছে কিন্তু এই দুনিয়ার বুকে আমার অসংখ্য হিতাকাঙ্খী প্রিয়জন থাকা সত্ত্বেও কেহ আমাকে সামান্য একটু সাহায্যও করিতে পারিতেছে না। এই দুশমনদের অন্তরে আমার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেন ধর্ম বিশ্বাসের ন্যায় দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়াছে। ইহাদের অপবিত্র অন্তর যেন শত্রুতারই আকর।

এদিকে মাওলানা আবদুল হক ও মাওলানা শামসুল হক খায়রাবাদী পিতার মুক্তির জন্য বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দায়ের করিয়াছিলেন। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধজীবী সম্প্রদায়ের তরফ হইতেও সরকারের নিকট বার বার মাওলানার মুক্তির জন্য আবেদন নিবেদন পেশ করা হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানার মুক্তির আদেশ হইল। মাওলানা শামসুল হক আদেশটি হাতে লইয়া আন্দামান রওয়ানা হইলেন। অভিশপ্ত দ্বীপে অবতরণ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, একটি জানাযা লইয়া যাওয়া হইতেছে। আর পশ্চাতে যেন সমস্ত আন্দামানের জনসাধারণ একত্র হইয়া শোক মিছিল করিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলেন যে, উহা মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদীর জানাযা। শেষ পর্যন্ত মাওলানা শামসুল হকও শোক সন্তপ্ত জনতার মিছিলে শরীক হইলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই অমূল্য নিধি আন্দামানের অভিশপ্ত দ্বীপে সমাহিত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

[আযাদী আন্দোলনঃ ১৮৫৭। লেখকঃ মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী। অনুবাদক মহিউদ্দিন খান]।

মক্কা-মদীনা ও অন্যান্য দেশ থেকে ইল্‌মে তাসাওউফ বিলুপ্তি এবং আলেম ও মুসলিম নিধনের ইতিহাস জানার জন্য পরবর্তী খন্ড পাঠ করুন।